হৌ হৌ রহস্য

অমিতাভ চক্রবর্তী

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৫৮

প্রচ্ছদ সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম পাঁচ টাকা

প্রকাশক অরুণকান্তি ঘোষ শিলালিপি কলিকাতা ৯

মুদ্রক রামপ্রসাদ নাগ সারদা প্রিণ্টার্স কলিকাতা ১২

গ্রন্থন কাশীনাথ পাল কৌশিক বাইণ্ডার্স কলিকাতা ৯

ঝুমঝুমি নিমু তাপসীকে

এক

গাড়ি এসে পৌঁছলো শেষ রাতে। প্ল্যাটফরমে নামতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস চোখের পাতা ছুঁয়ে যায়। নির্জন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে। ট্রেনটা হুইশিল বাজিয়ে চলতে শুরু করে। হঠাৎ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া একটি লম্বা লোক ওদের সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। ওরা হকচকিয়ে যায়। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না।

কাবলীবাবুর বাড়ি যাবেন তো? পরিস্কার বাংলায় লোকটি বললো।

ওরা আরও ঘাবড়ে যায়। লোকটি কে? কী করে জানলো, ওরা কাবলীকাকুর বাড়িতে যাবে? ওদের চিনলো কি করে?

কথা জোগায় না ওদের মুখে। বিস্ময়ে হতবাক। শেষ রাতের হিমেল হাওয়া গায়ে নিয়েও ওরা ঘেমে ওঠে।

ঠিক আছে। চলে যান। কোন ভয় নেই। বলেই লোকটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ওরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইলো অবাক চোখে।

ওরা মানে ডাবলু আর গাবলু।

ডাবলু আর গাবলু নামে যেমন মিল, মনের মিলও তেমনি। ওরা দুই বন্ধু। এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। দু'জনেরই বেড়াবার শখ খুব। কিন্তু কোথাও বড় একটা বেড়ানো হয়নি। বড়রা কেন যে বেড়াতে যায় না, তা ওরা বুঝতে পারে না। পরীক্ষা দিয়েই ওরা ঠিক করলো, বেড়াতে যাবেই। যেতে না দিলে পালিয়ে

যাবে। এখন তো আর কচি খোকাটি নেই। সমস্যা হলো, কোথায় যাওয়া যায়?

অনেক আলোচনা, তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো, কাবলীকাকুর ওখানে যাওয়াই ভালো। বেশি টাকা পয়সা তো পাওয়া যাবে না। গাড়ি ভাড়াটা নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসা। কাবলীকাকুর ওখানে বিনে পয়সায় থাকা খাওয়া। জায়গাটাও ভালো। ছোটনাগপুরের পাড়া গাঁ। পাহাড় আছে। নদী আছে। ঘন জঙ্গলও আছে। ছোট খাটো চিতাবাঘও দু'চারটে পাওয়া যায়।

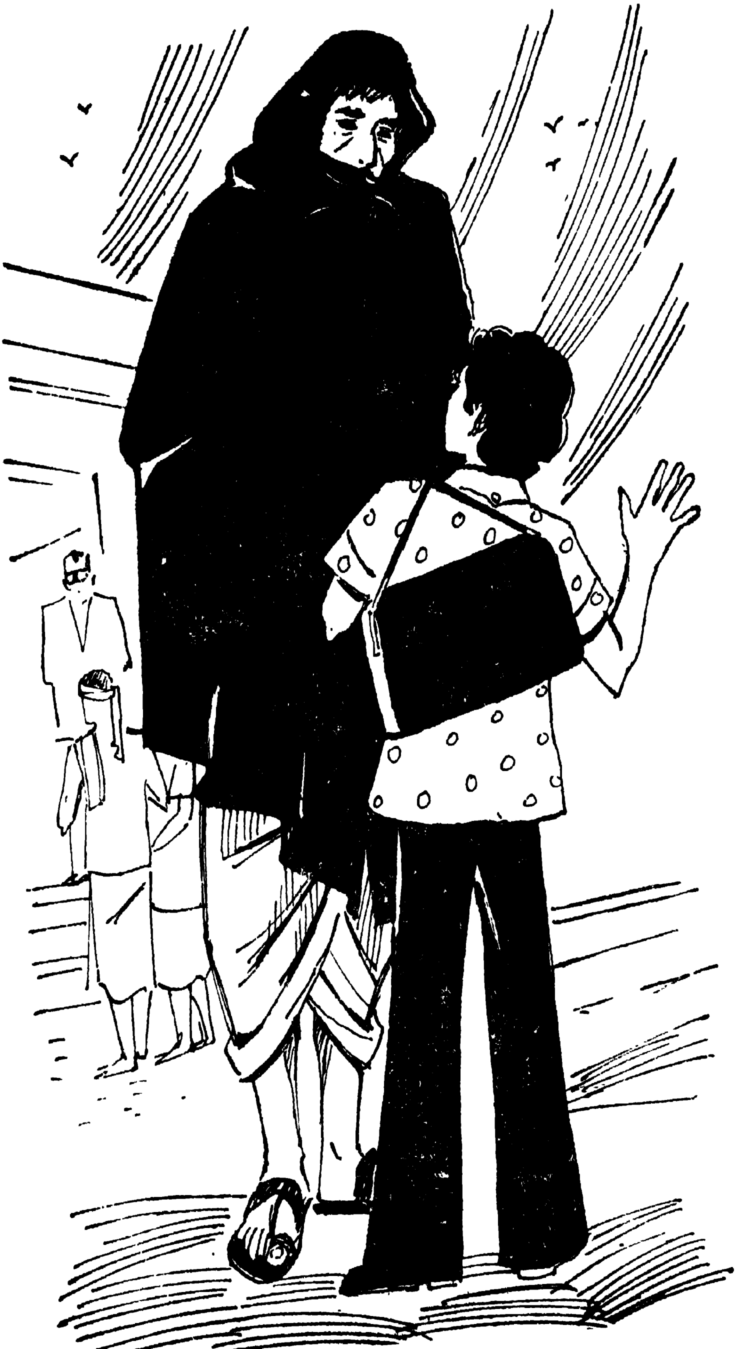
কাবলীকাকু কারো সত্যিকারের কাকু নন। ডাবলুর বাবার ছোট বেলার বন্ধু। দারুন সাহসী। ছোট বেলায় একা একা দেশ বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। অনেকদিন খোঁজ মেলেনি। বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিলেন, বেঁচে নেই। শেষকালে একদিন কাবলীকাকু নিজেই এসে হাজির। আর তখন জানা গেল কী সাংঘাতিক কাণ্ড সব। এখন কাবলীকাকু বিরাট বাড়ি করেছেন। জমি কিনেছেন। আর আছে কাঠের ব্যবসা।

অত জায়গা থাকতে ছোটনাগপুরের ওই অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি করলেন কেন? কে জানে? জায়গাটার নাম হোসেনাবাদ।

ডাবলু আর গাবলু স্টেশনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘামলো। ইতিমধ্যে দু'চারজন লোককে প্ল্যাটফরমে আসা যাওয়া করতে দেখে ওরা সাহস পায়।

চ। বেরোনো যাক। ডাবলু বলে।

কাউকে টিকিট দিতে হলো না। স্টেশন পেরোতেই সামনে রাস্তা। দু'পাশে কয়েকটা দোকান। সবে ঝাঁপ খুলছে। উনুনে আঁচ পড়েছে। সামনের বেঞ্চিতে দু'চারটে দেহাতী লোক। একজন রেলের পোশাক পরা। দোকানগুলো ছাড়িয়ে গেলে পথের পাশে সামান্য ঢালু জমিতে গোটা ছয়েক রিকশা। একটা রিকশার পাদানিতে রিকশাওয়ালা কুকুরকুণ্ডলী হয়ে ঘুমোচ্ছে। এক পাশের একটা বুড়ো বটগাছের নিচে ইট পাতা। চারপাশে ছড়ানো চুলের রাশি।



কাবলীকাকুর বাড়ি যাবেন তো? পরিস্কার বাংলায় লোকটি বলল।

লোকটা কে বললো? গাবলু ফিস ফিস করে বলে। চুপ করে থাক। ডাবলু শাসায়।

চা খাবি নাকি? গাবলুর জিজ্ঞাসা।

খাবো। বলে ডাবলু সামনেই যে দোকানটা, তার বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। পাশে গাবলু। তার পাশে ওদের কিট ব্যাগ। ততক্ষণ অন্ধকার কেটে গিয়েছে। চারপাশ বেশ পরিষ্কার। একটু পরেই সূর্য উঠবে। দূরে তাকালে কুয়াশা চোখে পড়ে।

চা খেতে খেতে ডাবলু দোকানীকে জিজ্ঞেস করে, হোসেনাবাদ কদ্দর?

হোসেনাবাদ? তা চার ক্রোশ হবে।

কিসে যাবো?

রিক্শায় যেতে পারেন। হেঁটেও যেতে পারেন।

রিকশায় ভাড়া কত, জানো?

ঠিক মালুম নেই। দু'তিন রূপিয়া হবে।

ওরা চা খাওয়া শেষ করলো। দাম মিটিয়ে দিলো।

আচ্ছা, কাবলীবাবুর মোকাম তো ওখানেই? ডাবলু জানতে চায়।

হ্যাঁ, জী। আপনারা ওখানে যাবেন?

হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?

না, কিছু না। একটা ব্যাপার......আচ্ছা, থাক।

না, না। বলোই না।

শুনছি কি, ওই বাড়িতে ভূত লেগেছে।

অ্যাঃ ভূত! কী রকম?

সে আমি জানি না। শুনছি, মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে।

ওঃ। ডাবলু আর কথা বাড়ায় না।

কয়েক পা এগিয়েই গাবলু বলে, কি রে কী সব শুনছি? তুই সব জেনে শুনে নিলি না কেন? এখন ভূতের খপ্পরে পড়বো নাকি?

ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি। ডাবলু ধমকে ওঠে।

ওরা প্রথমে ভেবেছিল হেঁটে যাবে। পরে ভাবলো, চার ক্রোশ সত্যি সত্যি চার ক্রোশ না তার বেশি ঠিক কি? ট্রেন জারনির পর এতটা হাঁটা যাবে না। তাছাড়া বিদেশ বিভূঁই, স্টেশনে আবার ওই রকম একটা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার উপরে ভূতের খবর... নাঃ রিক্শাতে যাওয়াই ভালো।

রিকশাওয়ালাকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হলো। কিন্তু কাবলীবাবুর কোঠিতে সে যেতে রাজি হলো না কিছুতেই। ডাবলু অনেক বোঝালো, পঞ্চাশ পয়সা বেশি দিতে চাইলো, তাতেও ব্যাটা রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, চৌমাথায় ওদের নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে ডাবলুদের আধমাইল হেঁটে যেতে হবে। অগত্যা ওরা তাতেই রাজি।

রিকশাটা চলতে না চলতেই গাবলু খপ করে ডাবলুর হাঁটু চেপে ধরে। কী ব্যাপার?

ওই ছাখ। গাবলু আঙুল তুলে দেখায়।

সামনে বেশ দূরে একটা লোক হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। সাদা চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া।

গাবলু শ্যেন দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। কথা বলে না। ডাবলু একবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়, একবার ওই মূর্তিটির দিকে।

রিকশাওয়ালা? গাবলুর গলা ভীষণ গম্ভীর।

ওই যে একটা লোক যাচ্ছে, ও কে?

মালুম নেহী, জী।

জোরে চালাও তো, ওকে ধরতে হবে।

রিকশাওয়ালা জোরসে প্যাডেল করে। গতি বাড়লো। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওই মূর্তিটিও যেন জোরে ছুটতে শুরু করলো। কিছুতেই ব্যবধান কমছে না। গাবলু ভেবে পায় না, এটা কী করে হয়। আর এই সময় মনে পড়ে যায় চাওয়ালার কথা, ওই বাড়িটাতে ভূত লেগেছে।

এক সময় মূর্তিটি বাঁক নিলো। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি।

রোদ উঠেছে। কাঁচা সোনার মতো রোদ দু'ধারে মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। লাল মাটির রাস্তা দিয়ে চলছে রিকশা। মাঝে মাঝে ঠুন ঠুন শব্দ। গরু মহিষ চলছে আলোর পথ ধরে। লাঙল কাঁধে চাষী। গোয়ালার কাঁধে বাঁক। মেয়েদের মাথায় হাঁড়ি। ঝাকে ঝাঁকে পাখি রোদের সোনা ডানায় কুড়িয়ে নিয়ে উল্লাসে চলেছে দূরে দূরান্তরে। গাছের পাতায় শিশিরের বুকে আলোর ছটা। ঘাসের শিয়রে মুক্তাবিন্দু। শীতল বাতাস ভিজিয়ে দেয় চোখের পাতা। এইসব দেখতে দেখতে ওরা এসে পৌঁছায় চৌমাথায়।

রিকশাওয়ালার কাছ থেকেই বাড়িটার হদিশ জেনে নিলো। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো। গাবলুকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আশ্চর্য, কাবলীকাকু যেমন রহস্যময় মানুষ, তার কাছে আসতে না আসতেই রহস্যের ছড়াছড়ি। ডাবলু কিন্তু মনে মনে বেশ ঘাবড়ে যায়। চেনা নেই শোনা নেই, কোথায় এলাম রে বাবা! পা দিতে না দিতেই সব ভূতুড়ে কাণ্ড?

কাবলীকাকুকে এ তল্লাটে সবাই বেশ চেনে, নারে? গাবলু বলে। চিনবেই তো। কেমন ডাকসাইটে লোক। বাবার মুখে শুনেছি, একবার ডাকাতদলের সঙ্গে খুব লড়েছিলেন। ডাবলু বলে।

ভূতের ব্যাপারটা কী বলতো? গাবলু এবার আসল কথাটা পাড়ে।

কী আবার? গেঁয়ো লোকরা অমন কথায় কথায় ভয় পায়। ডাবলু মুখে খুব সাহস এনে কথাটা বলে।

আচ্ছা, কাবলীকাকুকে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে তো?

বাবা লিখেছেন।

তাহলে ঠিক আছে। তুই লিখলে আবার ঠিকানা ভুল করতে পারতিস।

তাই নাকি? তুই হলে?

ডাবলুকে দাঁত খিঁচোতে দেখে গাবলু চুপ করে যায়। কিন্তু একটা কথা ও মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছে না, চিঠি যদি লেখা হয়ে থাকে আর কাবলীকাকু যদি তা পেয়ে থাকেন, তাহলে

স্টেশনে কাউকে না কাউকে পাঠানো উচিত ছিলো। তিনি নিজেও আসতে পারতেন। তাহলে কি, তিনি চিঠি পাননি? এই প্রশ্নটাই করবে ঠিক করেছিলো কিন্তু ডাবলুর ভাবসাব দেখে আর এগোলো না।

একসময় ওরা একটা বাড়ির সামনে এসে পড়লো। একতলা কিন্তু লম্বা চওড়ায় বিরাট বাড়িটা। চার পাশে অনেক জায়গা। তাতে নানা রকমের গাছগাছালি। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটার সামনে ফুলের বাগান। মস্ত গেট। গেটের এক পাশে হিন্দিতে লেখা "চৌধুরী ভবন।" ব্যস্. দেখতে হবে না, এটাই কাবলী চৌধুরীর বাড়ি।

গাবলুর মনে হলো, এত বড় বাড়ি কিন্তু বড় নিস্তব্ধ যেন। লোকজন নেই। সকাল সাতটাতেও কেমন নিঝুম নিঝুম লাগছে। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় একটা ডালিম গাছের দিকে। ডালিমের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। লোভীর মতো চেয়ে থাকে।

যাক্। গেটে লেখা নেই, কুকুর হইতে সাবধান। বাঁচা গেল। ডাবলুকে খুশি খুশি দেখায়।

তাতো হলো, ঢুকবি কী করে? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। গাবলুর ভাবনা।

গেটটায় তালা দেওয়া দেখছি না তো? ডাবলু বলে।

ঠেলে দেখবো? গাবলু বললো বটে কিন্তু সাহস করে এগিয়ে যেতে পারলো না।

ডাবলু কিছু একটা ভাবলো। তারপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে গেটটা ঠেলতে থাকে। নাঃ। একটুও নড়লো না।

তাই দেখে গাবলু বলে, কাবলীকাকুর নাম ধরে ডাক না?

ডাকতে হবে না। নির্ভয়ে চলে এসো।

কে যেন বলে উঠল। বাপস্! ওরা চমকে দু'পা পিছিয়ে আসে। একেই বলে বজ্রকণ্ঠ। পিলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম। কে বলছে, কোথেকে আসছে এই কণ্ঠস্বর? এসব ভাবার কোন সুযোগই

পাওয়া গেল না। তার আগেই লোহার ওই বিশাল গেট আপনা-আপনি খুলে গেল।

চলে এসো। আবার সেই ভয়ঙ্কর গলা।

গাবলু ডাবলুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। এক হাতে ডাবলুর হাত চেপে ধরে।

চলে এসো। নির্ভয়ে চলে এসো।

ওরা এগিয়ে যায়। লাল কাঁকর বিছানো পথে মস মস শব্দ ওঠে।

বাড়ির সামনে বারান্দা। বেশ চওড়া। খান চারেক বেতের চেয়ার। দেয়ালের মাঝখানে একটা ছবি, একটি সাঁওতালী মেয়ে মাথায় ফুল গুঁজে দাঁত বার করে হাসছে।

ওরা বারান্দায় উঠে এলো।

ডান দিকে যাও। সেই অদৃশ্য মানুষটির হুকুম।

ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই বাঁ দিকে অর্থাৎ বাড়িটার পুব দিকে একই রকমের বারান্দা দেখতে পেলো। ওরা পুবের বারান্দায় এলো। উত্তর মুখো সোজা চলে যাও।

চলতে লাগলো। ডাবলু প্রায় দিশেহারা। এর মধ্যেও নিজেই নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। গাবলুও যে ঘাবড়ায়নি, তা নয়। কেমন উদ্ভট আর রহস্যময়। খুব সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে।

স্টপ।

দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। দম দেওয়া পুতুলের মতই। চলছে, থামছে।

বঁা দিকের ঘরে থাকবে তোমরা। মংরু সব দেখিয়ে দেবে। অলরাইট?

হঠাৎ ডাবলু চিৎকার করে ওঠে, কাবলীকাকু?

ব্রেকফাসটের টেবিলে দেখা হবে। আড়াল থেকে কাবলীকাকুর বাজখাঁই উত্তর।

দুই

দেখা হলো।

গাবলু তো কাবলীকাকুকে দেখে অবাক। ও ভেবেছিলো, কাবলীকাকুকে কাবুলিওয়ালাদের মতোই দেখতে হবে। কিন্তু একি! ছোট্টখাট্টো একটি মানুষ। দেখলে একটুও ভয় হয় না।

একটা আস্ত পোচ মুখে দিয়ে কাবলীকাকু বললেন, কী খবর ডাবলুবাবু? হঠাৎ এসে হাজির হলে যে?

তার মানে? আমাদের তো আসবার কথাই ছিলো। আপনি বাবার চিঠি পাননি?

চিঠি? কৈ না তো?

আশ্চর্য!

এরপর অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলেনি। গাবলু একবার ভেবেছিলো ভুতুড়ে লোকটা আর ভূতের কথা বলবে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ও আর মুখ খুললো না।

তা তোমরা বেড়াতেই এসেছো, না অন্য কোন কাজ আছে? কাবলীকাকু জিজ্ঞেস করেন।

কাজ টাজ কিছু নয়। বেড়াতেই এলাম তো! ডাবলু বলে।

বেশ বেশ।

গাবলু কোন কথা বললো না। হঠাৎ ওর মাথায় একটা কোশ্চেন এসে গেল। মংরু কে? ওকে দেখলেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। ডাবলুকে বলতে হবে।

গাবলুবাবু কোন কথা বলছো না যে? কাবলীকাকু আদুরে গলায় বলেন।

গাবলু খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, এমন অজ পাড়াগাঁয়ে আপনার বাড়িটা বড্ড বেমানান। দেখছি, ইলেকট্রিসিটি আছে। সেটাও অদ্ভুত।

ঠিক ধরেছো। তোমার বেশ পাওয়ার অব অবজারভেশন আছে দেখছি।

ও তো ডিটেকটিভ হতে চায়। ডাবলু ফাঁস করে দেয়।

যাঃ। গাবলু মুখ নীচু করে। লজ্জা লজ্জা ভাব।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, ওর একদম সাহস নেই। ভীষণ ভূতের ভয়। ডাবলু হাসতে হাসতে বলে।

ভূতের কথা শুনে কাবলীকাকু হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যান। গাবলুর চোখ এড়ালো না।

এ বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে। চা শেষ করে কাবলীকাকু শুরু করলেন, তার আগে ইলেকট্রিসিটির কথাটা বলে নিই। চার মাইল দূর থেকে লাইন টেনে আনতে হয়েছে। এরজন্য আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু করলাম এইজন্যে যে, ইলেকট্রিসিটি না হলে আমার চলে না। প্রদীপের আলোয় কিম্বা হারিকেনের আলোয় আমি ভালো দেখতে পাইনা। তারচেয়েও বড় কথা আমার রিসারচের জন্য ইকেলট্রিক লাইট চাই-ই।

আপনি রিসারচ করেন? গাবলুর বিস্ময়।

করি। সে সব পরে বলবো। এবার শোনো বাড়িটার ইতিহাস।

দুই বন্ধু গল্প শোনার উৎসাহে মেতে ওঠে। চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে গুছিয়ে বসে। মোটা একটি চুরুট ধরিয়ে কাবলীকাকু বলতে শুরু করেন।

অনেকদিন আগেকার কথা। এই বাড়িটারই বয়স প্রায় একশ' বছর হতে চললো। একজন দেশী রাজার বাগানবাড়ি এটা। বাড়িটা বানিয়েছিলেন চৈতন সিং। বাড়িটার পেছনে আছে এক মস্ত দীঘি। দীঘিটার নাম গোলাপ বাঁধ। শোনা যায়, দীঘির জলে নাকি

গোলাপের গন্ধ পাওয়া যেত। এখন সে সব নেই। দীঘিটাও আগের মতো নেই। অনেকটাই হেজে মজে গিয়েছে।

চৈতন সিং ছিলেন খুব মজলিসী মানুষ। নাচ গানের ভক্ত। বছরের বেশির ভাগ সময়েই চৈতন সিং এখানেই কাটাতেন। রাজ-কার্য বড় একটা দেখতেন না। এখানে বড় বড় ওস্তাদদের গান-বাজনা শুনতেন। ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় দেখতেন রোশনী বাঈজীর নাচ। রাতভর। আর ছিলো শিকারের নেশা। এই ভাবে চলছিলো বছরের পর বছর।

কিন্তু একদিন সব গোলমাল হয়ে গেল।

কাক ডাকা ভোরে বেজে উঠতো সানাই। সেদিন বাজলো না। সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। চৈতন সিং ও তাঁর ইয়ার বন্ধুরা সব বেহুঁশ। খিদমতগার, হুকুমবরদারেরা খোঁজ করতে গিয়ে দেখে সানাই বাজিয়ে নিপাত্তা। তার বিছানার আশেপাশে রক্তের দাগ। হৈ চৈ পড়ে যায়।

জেনানা মহলেও তাজ্জব কাণ্ড। রোশনী বাঈজী নিখোঁজ। যেন কেউ তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সোর-গোল পড়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

একজন সাহস করে রাজামশাই-এর ঘুম ভাঙিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে। কিন্তু রাজামশাই নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। তার কানে কী ঢুকলো কে জানে। তিনি হুকুম দিলেন, কোই বাৎ নেহী। রূপ সিংকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারো। বলেই রাজামশাই গড়িয়ে পড়লেন ফরাসের উপর।

এই রূপ সিং হলো চৈতন সিং-এর ডান হাত। এর উপরই রাজ্য শাসনের ভার। রূপ সিং আবার সম্পর্কে রাজামশাই-এর দূর সম্পর্কের শ্যালক। রূপ সিংকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার কথাটা নেশার ঘোরে বললেও, কথাটা ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার সুযোগ পাননি। এই রূপ সিং-এর হাতেই চৈতন সিং-এর শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

এদিকে তো দু' দু'টো মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াতে সবাই ভয়

পেয়ে যায়। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। পাইক বরকন্দাজরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। এর মধ্যে কে একজন রটিয়ে দিলো, এসব ভূতের কাজ। ব্যস্ অর্ধেক লোকের প্রাণ তাতেই উড়ে গেল।

বিকেলের দিকে দীঘির জলে ভেসে উঠলো রোশনী বাঈজী আর সানাই বাদকের মৃতদেহ। রাজামশাইকে জানানো হলো। ততক্ষণ নেশা কেটে গিয়েছে। সব শুনলেন। দেখলেন। গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ একা একা ভাবলেন। তারপর হুকুম দিলেন, ঘোড়া তৈরি করো। রাজবাড়ি যাবো।

ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে নিয়ে আসা হলো। সঙ্গে আরও কয়েকটি ঘোড়া। তাতে দেহরক্ষীরা সওয়ার হয়েছে। হাতে বন্দুক। কোমরে পিস্তল এঁটে রাজামশাই ঘোড়ায় চেপে বসলেন। কিন্তু যাওয়া হলো না।

তার আগেই এসে হাজির হলো রূপ সিং। বন্দুকধারী ঘোড়-সওয়াররা ঘিরে ফেললো বাড়িটা। চৈতন সিং বুঝলেন। পিস্তল উঁচিয়ে আচমকা গুলি ছুঁড়লেন রূপ সিংকে লক্ষ্য করে। সে গুলি গিয়ে আছড়ে পড়লো লোহার গেটের গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে রূপ সিং নির্ভুল নিশানায় গুলি চালালেন চৈতন সিং-এর হাত লক্ষ্য করে। গুলি লাগলো কব্জিতে। হাতের পিস্তল ছিটকে পড়লো মাটিতে। বন্দী হলেন চৈতন সিং।

রাজ্যের সর্বত্র রটিয়ে দেওয়া হলো, রোশনী বাঈজী আর চৈতন সিং গোলাপ বাঁধের জলে ডুবে মারা গিয়েছে। এদিকে চৈতন সিংকে বন্দী করে রাখা হলো এই বাড়িটার শেষ মাথায় একটি নির্জন কুঠুরিতে। এক গ্লাস জল দিতে পর্যন্ত কেউ রইলো না। কয়েকদিন পরে সেই ঘরেই খেতে না পেয়ে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা যান চৈতন সিং। অন্ধকার কুঠুরিতে শেষ ক'টা দিন চৈতন সিং হাউ হাউ করে কেঁদেছেন। রাতের নিস্তব্ধতায় সেই করুণ কান্না অনেকদূর থেকে শোনা যেত। সেই থেকে এটা ভূতের বাড়ি হয়ে গেল।

কাবলীকাকু থামলেন। চুরুটটা তখনও অর্ধেক শেষ হয়নি।



নির্ভুল নিশানায় রূপ সিংয়ের গুলি এসে লাগল চৈতন সিংয়ের হাতে

কিন্তু কাবলীকাকু আর মুখে তুললেন না। অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলেন।

আপনি ভুতুড়ে বাড়ি জেনে শুনে কিনলেন? গাবলু প্রশ্ন করে।

কিনলাম। কারণ, জলের দরে পাওয়া গেল। একটু আধটু সারিয়ে নিয়ে দিব্যি থাকতেও লাগলাম। ভূতটুত কারো সঙ্গে দেখা হলো না। লোকেও বিশ্বাস করতে লাগলো, সত্যি ভূত নেই। কিন্তু...

শেষ করার আগেই গাবলু বলে উঠলো, কিন্তু এখন আবার ভূত এসেছে।

তোমরা কী করে জানলে? কাবলীকাকু বেশ গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন।

স্টেশনেই শুনলাম তো চাওয়ালার কাছে। রিকশাওয়ালা তো ভূতের ভয়েই বাড়ি পর্যন্ত এলো না। ডাবলু জানায়।

কাবলীকাকু কোন কথা বললেন না। হঠাৎ তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হতভম্ব দুই বন্ধু।

মংরু এসে বললো, বাবু ওইরকম। হঠাৎ আসেন, হঠাৎ যান। কথা বলতে বলতে চুপ করে যান। আবার চুপ করে আছেন তো আছেনই, হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে দেন। এ নিয়ে ভাববেন না। আপনারা বাঁধের কাছ থেকে ঘুরে আসুন। দুপুরে ফের দেখা হবে বাবুর সঙ্গে।

ওরা বাঁধের দিকে চললো। তখন সকাল ন'টা।

তিন

দুপুরে খেতে খেতে কাবলীকাকু বললেন, জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখলে? কেমন লাগলো?

খুব সুন্দর। ডাবলু খুশি খুশি গলায় বলে।

গাবলুবাবুর মত কী?

ভালো। এ গ্রামে কি পাকা বাড়ি এই একটাই?

প্রশ্ন শুনে কাবলীকাকু মুখ তুলে দেখলেন গাবলুকে। একটু হেসে বললেন, বাড়ি এই একটাই। আর যা আছে, তাহলো একটা মন্দির—সীতারামজীর।

কতদূর সেটা?

বেশিদূর নয়। আধমাইলেরও কম।

ডাবলু এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সত্যি বলতে কি, ও গাবলুর এই খাপছাড়া কথাবার্তা শুনে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছে। ভীতু হলে হবে কি, গাবলুর মাথায় অনেক বুদ্ধি। কিছু একটা মানে নিশ্চয়ই আছে মন্দিরের ব্যাপারে।

কাবলীকাকু, আজ সকালে স্টেশনে একটা কাণ্ড হয়েছে। ডাবলু কথাটা পাড়লো।

কী রকম?

ডাবলু স্টেশনে সেই চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটার কথা বললো কাবলীকাকু শুনলেন মন দিয়ে।

বললেন, আশ্চর্য তো!

আমরাও দারুন অবাক হয়েছি। গাবলু বলে।

কাবলীকাকু আবার হঠাৎ খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

দরজার দিকে যেতে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, পোস্ট

অফিসে লোক পাঠিয়েছিলাম। গতকাল আমার নামে একটা চিঠি সত্যি এসেছিলো। কিন্তু আমি পাইনি।

চিঠিটা কি ডেলিভারি দেওয়া হয়েছিল? গাবলুর প্রশ্ন।

কে একজন আমার নাম করে নিয়ে এসেছে। ওরাও বিশ্বাস করে দিয়ে দিয়েছে। ওরা ভেবেছে, লোকটাকে আমিই পাঠিয়েছি।

লোকটা কী রকম দেখতে কিছু বলতে পারলো?

সে প্রশ্ন করিনি।

বলেই কাবলীকাকু তীরবেগে ছুটে গেলেন। এই ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। দুই বন্ধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

বিকেলের দিকে ওরা বেড়াতে বের হলো।

চ। মন্দিরটা দেখে আসি। গাবলু বলে।

ডাবলুরও আপত্তি নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হলো। মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সরু। দু' পাশে ঘন ঝোপঝাপ। অনেকদিন কেউ এ পথে আসে না, দেখলেই বোঝা যায়।

চলতে চলতে হঠাৎ একসময় গাবলু বসে পড়ে কী যেন খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

মাথা নীচু করে ডাবলু দেখবার চেষ্টা করে। কিছুই চোখে পড়ে না।

কী দেখছিস? ডাবলুর প্রশ্ন।

ছাখ! বলে গাবলু আঙুল দিয়ে দেখায়। বৃষ্টিভেজা নরম মাটিতে লাঠি বসে যাওয়ার গর্ত। চার পাঁচ হাত দূরে ওই রকম আর একটা গর্ত। আবার আর একটা।

এর মানে কী বলতো? গাবলু জিজ্ঞেস করে।

জানি না।

রণপা-র দাগ। কেউ রণপা চালিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করেছে।

সত্যি?

আমার সেইরকমই ধারণা। চল, এগিয়ে যাওয়া যাক।

ওরা এগিয়ে গেল। ডাবলু একটু সতর্ক হয়ে চলতে থাকে। রণপা টনপার ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে। মন্দিরটা ছোট। খুবই পুরনো। প্রায় জরাজীর্ণ। কারনিশ ফুঁড়ে বটগাছ মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। দেয়ালে জমাট শ্যাওলার কালো রঙ। কপাট ক্ষয়ে গিয়েছে তলার দিয়ে। দু'পাশের দেয়ালে দু'টি ছোট জানালা। বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়।

একটা কিন্তু মজার ব্যাপার আছে। গাবলু বলে।

কী? ডাবলুর প্রশ্ন।

তালাটা দেখেছিস? একেবারে নতুন। এরকম একটা পুরনো নির্জন ভাঙা মন্দিরে নতুন তালা লাগাতে আসবে কে?

তাইতো!

মন্দিরে ওঠবার দু'টো ধাপ সিঁড়ি। একসময় বাঁধানো ছিলো। এখন ক্ষয়ে গিয়েছে। ইটগুলি বেরিয়ে আছে। গাবলু নীচু হয়ে কিছু একটা লক্ষ্য করছিলো।

বললো, নাঃ। পাওয়া গেল না।

কি খুঁজছিলি? ডাবলু জানতে চায়।

পায়ের ছাপ টাপ যদি পাওয়া যেত। গাবলু খুব হালকা গলায় বলে।

ফেরার পথে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। ডাবলুর মাথায় সেই চিঠির ব্যাপারটা গজগজ করছে। বাবার চিঠিটা কাবলীকাকুর হাতে পৌছলো না কেন? কে নিয়েছে চিঠি? তার উদ্দেশ্য কী?

চিঠি গায়েব হওয়ার ব্যাপারটায় তোর কী মনে হয়? ডাবলু প্রশ্ন করে।

মনে হয় অনেক কিছুই। একটা কথা ঠিক, কেউ না কেউ কাবলীকাকুর উপর নজর রেখেছে। তাদেরই একজন চিঠিটা সরিয়েছে। স্টেশনে যে লোকটা আমাদের অবাক করে দিয়েছিলো, সে ওই দলের। চিঠির খবর সে জানে। তা না হলে আমাদের আসার খবর তার জানার কথা নয়।

ঠিক। কিন্তু কাবলীকাকু তো এ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন।

গাবলু এর কোন উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, কাবলী-কাকু ছাড়াও এখানে আরও কেউ আছে, যে বাংলা পড়তে পারে। তাই নয়?

ডাবলু অবাক। সে বুঝতে পারে না। বলে, তার মানে?

তার মানে তো খুব সোজা। চিঠিটা বাংলায় লেখা ছিলো। কাবলীকাকু চিঠি পাননি। এখানে বাঙালী বা বাংলা জানা লোক কাবলীকাকু ছাড়া আর কেউ না থাকারই সম্ভাবনা। কিন্তু যারাই চিঠি হাতিয়ে থাকুক, তারা চিঠির বিষয়বস্তু জানতে পেরেছে। হয় তাদের মধ্যেই বাংলা জানা লোক আছে, নয়তো অন্য কাউকে দিয়ে চিঠি পড়িয়ে নিয়েছে।

সেটাই সম্ভব।

না। সেটাই অসম্ভব। কাবলীকাকু এখানে খুবই পরিচিত নাম। তাঁকে লেখা কোন চিঠি যদি কেউ অন্য কাউকে পড়তে দেয়, তাহলে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায়? কেউ কি সেরকম বোকামি করে?

তাহলে?

তাহলে ওই দলের মধ্যেই বাংলা জানা কোন লোক বা বাঙালী কেউ আছে।

ডাবলু মেনে নেয়।

কাবলীকাকুর একটা এক্কা গাড়ি আছে। তাই হাঁকিয়ে তিনি গেছেন শহরে। ফিরতে দেরী হবে।

মংরু বললো, চা দেবো আপনাদের?

দাও। ডাবলু গুছিয়ে বসলো। বারান্দায় গুটি কয়েক চেয়ার। গাবলুও বসে।

সন্ধ্যেবেলাটা ওরা দু'জনে কলকাতার গল্প করে কাটিয়ে দেয়। কেউই কলকাতার ছেলে নয়। দু'জনেরই মামাবাড়ি কলকাতায়। কতবার গিয়েছে ওরা কলকাতায়। কিন্তু কলকাতার গল্প দু'জনের দু'রকম। তার কারণ, ডাবলুর মামারা থাকেন দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জে। আর গাবলুর মামাবাড়ি শোভাবাজারে।

গল্প করতে করতে ওদের মাথায় ভূত চাপলো। ওরা ভূতের গল্পে মেতে উঠলো। ডাবলু বললো, আমার ছোটমামা ভূতের রান্না খেয়ে সেই যে পেটের অসুখ বাধালো, আজও তা সারে নি।

বলিস কি? ভূতের হাতের রান্না? গাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে।

সত্যি। সত্যি ঘটেছিল। আমি তখনও হইনি। মার কাছে গল্প শুনেছি। ডাবলু একটু গুছিয়ে বসলো। গল্প বলার জন্যই। অন্ধকার নেমে এসেছে। কাবলীকাকু বাড়ি নেই। মংরুর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িটা নিটোল নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। কান পাতলে খুব ক্ষীণ ঝিঁঝিঁর আওয়াজ শোনা যায়।

একবার ছোটমামা তাদের দেশের বাড়িতে গেলেন। কী একটা দরকার পড়েছিল। খাজনা দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই বোধহয় গোলমাল। বড়মামা দিল্লিতে। দাদুর শরীর খারাপ। অগত্যা ছোটমামা অর্থাৎ নরেশবাবুকেই যেতে হল।

দেশের বাড়িটা তখন খালিই পড়ে থাকত। মেমারি স্টেশনে নেমে বাসে বা রিকশায় যেতে হত আঝাপুর। সেখানে নরেন ডাক্তারের বাড়ির কাছাকাছি নরেশবাবুদের বাড়ি। বাড়িতে দেখাশুনা করার জন্য আছে ওই গ্রামেরই হীরু ঘোষ। তার কেউ নেই। একলা মানুষ। বয়স হয়েছে যথেষ্ট। দেখাশোনা আর করতে পারেন না। বাড়িটাকে বুনো গাছগাছালি একেবারে ছেঁকে ধরেছে। বর্ষায় জঙ্গলে যেন ঢাকা পড়ে যায়। নরেশবাবু এমনি এক বর্ষার দিনে রাত করে দেশের ওই বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

ও হীরুদা, কোথায় গেলে? দেউড়ির সামনে এসে নরেশবাবু হাঁক দিলেন।

প্রথমটায় কোন সাড়া শব্দ মিলল না। নরেশবাবু আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করলেন। শেষটায় দেখতে পেলেন, একটা লম্প এগিয়ে আসছে। দেখে আশ্বস্ত হলেন। একটু ভয় ভয় করছিল। আলো হাতে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়টয় চলে গেল।

হীরুদা নাকি?

আজ্ঞে। ছোটবাবু ?

হ্যাঁগো। কতক্ষণ ধরে ডাকছি, তুমি শুনতে পাওনি ?

হীরুদা তার জবাব দিল না। প্রশ্ন করল, তা দাদাবাবু হঠাৎ এলেন যে ?

এবার নরেশবাবু অবাক হলেন। বিস্ময়ের সুরে বল্লেন, সে কি ? তুমিই তো চিঠি লিখলে বাবাকে আসতে। খাজনার ব্যাপার নিয়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে। আসা দরকার। তা বাবার শরীরটা ভাল নয়, আমাকে পাঠালেন।

ও। আসুন। হীরুদা আলো দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়।

নরেশবাবুর কেমন খটকা লাগে। পরে ভাবলেন, বুড়ো মানুষ। সব কথা সব সময় হুট করে মনে আনতে পারে না। চিঠিটা অবশ্য লিখেছেন দিন দশেক আগে। কলেজে পড়া কামাই করে তখন আসা সম্ভব ছিল না।

আসতে একটু দেরি হল......নরেশবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

তা একটু দেরি হল বৈ কি ? হীরুদা ঝটিতি জবাব দেয়।

রাত্রে খেতে বসে নরেশবাবু শুধোলেন, হীরুদা কেমন আছো ?

খুব ভাল। তবে আজকাল চোখে আর তেমন দেখতে পাইনে। দাদাবাবু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে জানিয়েছে, আপনারা নাকি অনেক বছর খাজনা দেননি।

আচ্ছা, আচ্ছা সে আমি কাল গিয়ে দেখব। তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি তো এসেই গিয়েছি। হীরুদা, তুমি এই নির্জন পুরীতে বুড়ো মানুষ একা একা থাকো, তোমার ভয় করে না ?

ভয় কিসের ? দেখতে তো প্রায় পাইই না, কানেও শুনি কম। তাহলে আর ভয় ঢুকবে কোথা দিয়ে ?

আরে ভয় তো লাগে মনে !

হীরুদা চুপ করে থাকে।

নরেশবাবু হঠাৎ অন্য কথায় চলে যান। হীরুদা, তোমার হাতের

রান্না খুব ভাল। এই রাতে এত তাড়াতাড়ি কী করে রাঁধলে? এদিকে বলছো চোখে ছ্যাখো না। কানেও শোনো কম।

রাঁধে মন। হীরুদার গলায় এই রকম জবাব শুনে নরেশবাবু চমকে ওঠেন। পালটা জবাব পেয়ে খুশি হন। অল্প শব্দ করে হেসে ওঠেন। চোখ ফিরিয়ে হীরুদার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে যান। সত্যি বলতে কি, এতক্ষণ হীরুদাকে ভালো করে দেখাই হয়নি। এবার সরাসরি মুখ তুলে তাকাতেই নরেশবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কী রকম মুখটা? রক্তশূন্য, সাদা ধবধবে। হীরুদার গায়ের রঙ কালো না ফর্সা? মনে পড়ছে না। চোখে কোন আলো নেই। মরা মাছের মত বিবর্ণ। দেখলে মনে হয়, প্রাণহীন স্পন্দন-হীন। এক মড়ার মাথা।

নরেশবাবু চটপট খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েন আঁচাতে আঁচাতে একটু গলা চড়িয়ে ডাকেন, হীরুদা?

দাদাবাবু? দূর থেকে যেন সাড়া দিল।

তোমার শরীর খারাপ নাকি?

আজ্ঞে না। ক'দিন আগে একটু জ্বর মত হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। দাদাবাবু, এদিকে আজকাল সাপের বড় উৎপাত বেড়েছে।

শেষের কথাটা কেমন বেখাপ্পা শোনালো নরেশবাবুর কানে। কিছু বললো না।

শুতে গিয়ে দেখলে বেশ পরিপাটি বিছানা। ধপধপে সাদা চাদর। বালিশে নতুন ওড়। নরেশবাবু অবাক হন। এতটা তিনি আশা করেন নি। আশা করাও উচিত নয়। হঠাৎ মনে হল, এ বাড়িতে কি আর কেউ আছে? কোন মহিলা? পরক্ষণেই মনে পড়ল, তা কি করে হবে? হীরুদার তো তিনকুলে কেউ নেই।

যাক্ গে। বেশি ভাবনা চিন্তা করার দরকার কি? নরেশবাবু মশারি গুঁজে দিয়ে টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর শোয়া মাত্র ঘরের হ্যারিকেনটা দপ করে নিভে গেল। ঘরে তো হীরুদা নেই। নরেশবাবু ছাড়া আর কেউই নেই। তাহলে হ্যারিকেনটা নেভালো কে? প্রশ্ন মনে এলো নরেশবাবুর। আবার

বুকের মধ্যে সেইরকম ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তারপর ভাবল, হয়তো হাওয়ায় নিভে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু সারারাত ধরেই একটা অস্বস্তি। কিছুতেই ঘুমোতে পারছেন না নরেশবাবু। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসে। হঠাৎ কী একটা যেন চোখে পড়ে, কিম্বা কিছু একটা কানে আসে, নাকে লাগে, অমনি ঘুম কেটে যায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। বৃষ্টি নেই। একটা থমথমে ভাব। বাতাস বইছে, এমন লক্ষণ নেই। থেকে থেকে মনে পড়ে যায়, হীরুদা বলছিল এদিকে সাপের উপদ্রব খুব বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাপ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হীরুদার সেই মড়ার মত নিথর মুখ ঘুরে ঘুরে চলে আসছে মুখের সামনে। এমন নয় যে, হাত দিয়ে সরিয়ে দেবে। হ্যারিকেনটা হঠাৎ নিভে গেল কেন?

এইভাবে অস্বস্তি দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মধ্যে দিয়ে রাত কেটে যায়। ভোর না হতেই নরেশবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে এসে দেখেন, আকাশ পরিষ্কার। গতকাল রাত্রের ঘটনায় মন বিগড়ে আছে। ভাবলেন ভোরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আসি। চটি পায়ে বেড়িয়ে এলেন। বাড়ি থেকে রাস্তায় আসতে আসতে চোখে পড়লো, জঙ্গলে চারিদিক ছেয়ে গেছে। এভাবে আর দু'একটা বর্ষা কাটলে এটা ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে।

রাস্তায় নেমে না ঘুমোনোর ক্লান্তি অনেকটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল চোখে মুখে। গ্রামের সব রাস্তাই নরেশবাবুর জানা। গ্রামের লোকজনরা ভোর না হতেই উঠে পড়ে। তবু এদিন নরেশবাবুর নজরে পড়লো, লোকজন বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। হতে পারে, বর্ষাকালে একটু দেরি করে ওঠার অভ্যেস হয়েছে অনেকের। কিন্তু একজনের সঙ্গে দেখা হবেই·········

ভাবতে ভাবতেই স্কুলবাড়ির পেছনদিককার রাস্তায় নরেন ডাক্তারকে দেখতে পেলেন নরেশবাবু। হন হন করে আসছেন।

কাছে আসতেই নরেশবাবু প্রণাম করলেন। বললেন, ভালো আছেন কাকাবাবু?

কে ?

আমি। নরেশ।

ও। জীতেনের ছেলে তুমি ?

এরপরেই ডাক্তারবাবু অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নরেশবাবুর দিকে।

এই সময়ে তুমি ?

এ্যাই একটু বেড়াতে বেরোলাম। কাল রাতে এসেছি।

কাল রাতে এসেছো ? উঠেছো কোথায় ?

এবার নরেশবাবুর অবাক হওয়ার পালা। এ প্রশ্ন কেন ? তাঁদের যে একটা বাড়ি আছে, তাতো ডাক্তারকাকুর অজানা নয়। সে কথা গোপন রেখে স্বাভাবিক গলাতেই নরেশবাবু জবাব দেন, আমাদের বাড়িতেই।

তোমাদের বাড়িতে ? তা খাওয়া দাওয়া করলে কোথায় ?

কেন ? হীরুদা তো রয়েছে। সে-ই রেঁধে দিলে।

কী বলছো তুমি নরেশ ?

ডাক্তারকাকুর কথা শুনে আর চোখমুখের ভাব দেখে নরেশবাবু হকচকিয়ে যান। ব্যাপারটা কি ? এর মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যাপার তো তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গতকাল রাতে ওঁর ভালো ঘুম হয়নি। সেটা সত্যি। কিন্তু এরকম তো হতেই পারে এক আধ দিন।

তুমি নিজে বলছ, হীরু তোমাকে রেঁধে খাওয়ালো ?

তাই তো কাকাবাবু।

মাই গড। কী বলছো তুমি, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

কেন ? কিছু হয়েছে নাকি হীরুদার ?

তোমরা কিছু খবর পাওনি ?

না তো।

হীরু তো পরশুদিন মারা গিয়েছে।

এ্যাঃ কি বলছেন আপনি ? আমি তো কাল......

আমি যে নিজে হাতে ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছি। পাড়ার ছেলেরা শ্মশানে নিয়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে ডাবলু দম নিল।

তারপর ? তোর ছোটমামা কী করলেন ? গাবলুর প্রশ্ন।

তারপর খুব সোজা। ছোটমামা আর বাড়ি পর্যন্ত যান নি। ওখান থেকেই ডাক্তারকাকুকে আর একটা প্রণাম করে সোজা মেমারি স্টেশনে। সেখান থেকে কলকাতায়।

আর সেই থেকে পেটের অসুখ। এখনও সারেনি। গাবলুর মন্তব্য।

ঠিক।

দারুণ!

গাবলুর শেষ মন্তব্যটা যেন কেমন শোনালো ডাবলুর কাছে। গাবলু কি গল্পটা বিশ্বাস করছে না ? না করুক। এবার গাবলুর পালা।

এবার তুই বল। একটা সত্যিকারের ভূতের গল্প।

আমার মামা কাকা জ্যাঠা কেউই তো ভূত দেখেন নি। কেউই কখনও ভূতের নাগালে পড়েন নি। তাহলে কি করে সত্যি ভূতের গল্প বলবো ? গাবলু বোঝাবার চেষ্টা করে।

তা হোক। তোকে বলতেই হবে।

তাহলে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হয়।

বানানো গল্প তো অনেক পড়েছি। সত্যিকারের গল্প চাই একটা। আচ্ছ, তুই কখনও ভূত দেখেছিস ?

দেখেছি। গাবলু ফুম করে বলে বসে।

ব্যাস্। তাহলে তো হয়েই গেল। সত্যি, তুই দেখেছিস ?

মনে মনে হাসতে থাকে গাবলু। মুখে বলে, সত্যি দেখেছি। একেবারে জলজ্যান্ত ভূত।

বলে যা। বলে যা। আমি একটাও ভূত দেখিনি।

গাবলু একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে শুরু করল।

পাহাড়ী এলাকায় একটি ছোট গ্রাম। বেশির ভাগই কাঠের বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির দেয়াল ইঁটের কিন্তু ছাদ হয় কাঠের, নয়ত এ্যাসবেসটসের। মাইল ছ'য়েক দূরে বড় শহর। ব্যবসাবাণিজ্যের

কেন্দ্র। বড় বড় ব্যবসায়ীরা একটু নির্জনে থাকার জন্য এই এলাকায় বাড়ি ঘর বানিয়েছিল। এর মধ্যে একটা বাড়িতে কোন লোকজন নেই। বহুদিন ধরেই বাড়িটা একলা দাড়িয়ে থেকে থেকে এক সময় ভূতের বাড়ি বলে পরিচিত হয়ে যায়। এখন অনেকে বলতেও পারে না, বাড়িটার মালিক কে। আগে যিনি এই বাড়িতে থাকতেন, একদিন দেখা গেল তিনি ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন। তারপর থেকে কেউ আর ওই বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে আসেনি। বাড়ির সেই মালিক ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী। রাত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায়, ওই বাড়ি থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রথম প্রথম আশেপাশের বাড়ির লোকেরা বেশ ভয় পেত। এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

এদিকে ওই বাড়িটার সম্বন্ধে একটা গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায়, ওই বাড়ির একটি চোরা কুঠুরিতে নাকি অনেক টাকা পয়সা লুকানো আছে। এই খবর পাহাড়ী এলাকা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে, দু'একজন লোক এসে ওই বাড়িতে ওঠে। হয়তো গুপ্তধন খুঁজে বার করতে। কিন্তু কেউই এক রাতের বেশি বাড়িটাতে থাকতে পারে না। রাত পোহাতে না পোহাতেই আগন্তুকরা উর্ধশ্বাসে দৌড় মারে। ব্যাপারটা কি ? সেই ভূতের ভয়। সারারাত ধরে ভূতের উপদ্রবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালাবার আর পথ পায় না। এই রকম চলছিল অনেক দিন ধরেই। ক্রমে ক্রমে স্থানায় লোকজনের কাছেও বাড়িটার সম্পর্কে কৌতুহল কমে আসে।

এমন সময় একদিন বিকেল নাগাদ এক ভদ্রলোক এসে উঠলেন ওই বাড়িটাতে। বিশাল চেহারা ভদ্রলোকের। সাতমণি পালোয়ানের মতই। আশপাশের দু'একজন দেখলেন ভদ্রলোককে কিন্তু কেউ এগিয়ে গিয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না। তবে একটা জিনিষ সকলেরই নজরে পড়লো। ভদ্রলোক একটা জীপে চড়ে এসেছেন। নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। পরে ভদ্রলোকের পরিচয় জানা যায়। নাম সুনীল সাহা।

সুনীলবাবু বাড়িটার মধ্যে ঢুকলেন। সঙ্গে সবই ছিল, মোমবাতি টর্চ, ওয়াটার বটল আর হালকা একটা বিছানা।

পরদিন সকালে সবাই দেখল, সুনীলবাবু জীপ হাঁকিয়ে ফিরে গেলেন। এই নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামালো না। এইরকমই হওয়ার কথা। এ যাবৎ কাউকেই এক রাতের বেশি থাকতে দেখা যায়নি। ভূতের ভয় এমনই যে সকালটাও কেউ আর নষ্ট করতে চায় না। সাত সকালেই পালাতে পারলে বাঁচে। সুনীলবাবুও বেশ সকাল সকাল চলে গেলেন।

কিন্তু সবাই অবাক হল দিন দুই পরে। সেই সুনীলবাবু আবার ফিরে এলেন। জীপ থামালেন ভূতের বাড়ির সামনে। স্থানীয় লোকেরা এবার রীতিমত চমকালেন। নিজেদের মধ্যে অনেকদিন বাদে উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা চলতে লাগলো। একই লোককে দু'দু'বার ওই ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে দেখা যায়নি কখনও। ব্যাপারটা কি ? প্রশ্ন সকলেরই। উত্তর নানা রকম। শেষমেষ বেশ একটা রহস্যই রয়ে গেল।

দ্বিতীয় বারেও সুনীলবাবু রাত্রি কাটিয়ে সকাল বেলাতেই জীপে শব্দ তুলে তড়িঘড়ি চলে গেলেন। সেদিন স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক, তারা একটু সকাল সকাল উঠেছিলেন, যদি কিছু একটা চোখে পড়ে, যদি রহস্যের হদিশ মেলে! না। তেমন কিছু কেউ আবিষ্কার করতে পারলেন না।

সুনীলবাবু আবার এলেন। বার বার তিনবার। কিন্তু তৃতীয়বার সকালে আর তিনি জীপ ছুটিয়ে শহরমুখো হলেন না। সোজা গিয়ে উঠলেন দক্ষিণ দিকের শেষ বাড়িটায়।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। মোরাম বিছানো পথ পেরিয়ে উঠলেন বারান্দায়। তারপর দরজার কাছে। কড়া নাড়লেন।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রায় বৃদ্ধ বলিষ্ঠ চেহারার একটি মানুষ।

কৈলাশবাবু, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।

আ-আ-আমাকে ? কেন?

জলজ্যান্ত একটি ভূতকে পেলে পুলিশ খুশি হবে। সুনীলবাবু রসিকতা করলেও বললেন কিন্তু বেশ গম্ভীর গলায়।

এই হলো আমার ভূতের গল্প। এই বলে গাবলু একটা হাই তুলল।

তুই যে বললি নিজের চোখে ভূত দেখেছিস? ডাবলু ফোঁস করে ওঠে।

দেখেছিই তো। কৈলাসবাবু আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন। তাঁকে কতবার দেখেছি।

কৈলাসবাবু তো সত্যি আর ভূত নন?

এইখানেই তো মজা। আসলে কী হয়েছিল জানিস, গুপ্তধনের গল্পটি কৈলাসবাবুও বিশ্বাস করতেন। রাতে তিনিই গুপ্তধনের খোঁজে এখানে ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতেন। আমরা তাই মাঝে মাঝে ওই বাড়ি থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ শুনতাম। বাইরে থেকে যারা আসতো, তাদের রাত্রে ভূতের ভয় দেখাতেন ওই কৈলাসবাবু। কৈলাসবাবুর ধারণা ছিল, একদিন গুপ্তধন উনি পাবেনই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হল পুলিশের হাজতে।

কিন্তু কৈলাসবাবুই ওসব কাণ্ড করতেন, তা সুনীলবাবু জানলেন কি করে? ডাবলুর সন্দেহ যায় না।

সেটা অবশ্য সুনীলবাবুর মুখ থেকেই শোনা। গোয়েন্দা দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছিল সুনীলবাবুকে ওই ভূতের বাড়ির রহস্য উদ্ধার করতে। কাজটা যে সহজ হয়ে আসবে তা সুনীলবাবুও জানতেন না। প্রথম রাত্রেই তিনি খুঁজে পেলেন কৈলাসবাবুর লেখা একটি ডায়েরী। আর তা থেকেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কৈলাশবাবু কিন্তু তিনদিনের একদিনও সুনীলবাবুকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করেননি।

হুঁ। কিন্তু, গল্পটা যেন পড়েছি মনে হচ্ছে।

হতে পারে। কিন্তু সত্যি। যেখানেই ঘটুক।

হোসেনাবাদেও সেদিন রাত্রে একটা কাণ্ড হলো। তখন রাত

দুপুর বলতে গেলে। গাঢ় অন্ধকার। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দুই বন্ধু শুয়ে আছে পাশাপাশি। মশারির মধ্যে। খুট করে একটা শব্দ হলো। গাবলুর ঘুম ভেঙে যায়।

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো গাবলু। একটা ছায়ামূর্তি। ঘরের দরজাটা খোলা ছায়ামূর্তিটি সন্তর্পণে একবার ওদের মাথার কাছে এলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। গাবলুর বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ভাবলো, ডাবলুকে ডেকে তুলবে। কিন্তু কী মনে হলো, ডাবলুকে আর ডাকলো না। নিঃশব্দে চোখ খুলে পড়ে রইলো।

ছায়ামূর্তিটা একসময় ওদের কিট ব্যাগ দু'টো হাতড়াতে লাগলো। চোর? গাবলু প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলো আর কি! কিন্তু শব্দ বেরুলো না। অপলক দু'চোখে চেয়ে থাকে।

দু'এক মিনিট পরে ছায়ামূর্তিটা আচমকা দরজা পেরিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাবলুর হুঁশ হয়।

এ্যাই, ডাবলু ওঠ, ওঠ।

ঠেলা খেয়ে ডাবলু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

কী হলো?

আলো জ্বাল।

হলোটা কী?

বলছি। আগে আলো জ্বাল না।

ডাবলু কিছুই বুঝতে না পেরে মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে হাতড়িয়ে সুইচ টেপে। কম পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠতেই ডাবলু চাপা চিৎকার করে ওঠে, একি! দরজা খোলা কেন?

গাবলু সব বললো। শুনে ডাবলু একবার ছুটে বারান্দায় যায়। কিছুই দেখতে পায় না।

ফিরে এসে বলে, কাবলীকাকুকে ডাকবো?

দরকার নেই। কিট ব্যাগ দু'টো খুঁজে দেখতো?

ডাবলু ভালো করে খুঁজলো। একবার, দু'বার। কিছুই তো খোয়া যায়নি। ডাবলু বলে।

নেবার মতো কিছু ছিলো না ভাই।

তার মানে, সাধারণ চোর নয়।

নিশ্চয়ই নয়। শুয়ে পড়।

চার

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কাবলীকাকুর সঙ্গে দেখা। দুই বন্ধুর কেউই কাল রাতের ঘটনার উল্লেখ করলো না।

গাবলু বললো, এখানে বাঙালী আর কেউ আছে নাকি আপনি ছাড়া ?

কাবলীকাকু মুখ তুলে তাকান। অল্প করে হাসেন। বলেন, তুমি যেন রহস্যের গন্ধ পেয়েছো মনে হচ্ছে ?

প্রায় সেইরকমই। আপনি ছাড়া আর কোন বাঙালী নেই এখানে ?

আছে। আর একজন। ডাকঘরের পিয়ন।

কী নাম তার ?

হরবিলাস কি যেন ! রায় কি সেন হবে বোধহয়।

ডাবলু চুপচাপ খেয়ে যায়। চা শেষ করে গাবলু আবার প্রশ্ন করে, আমরা যখন প্রথম এলাম, আপনি তখন ঘরে বসে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। গলার আওয়াজটা ছিলো গমগমে। এ বাড়িতে কী মাইক্রোফোন আছে ?

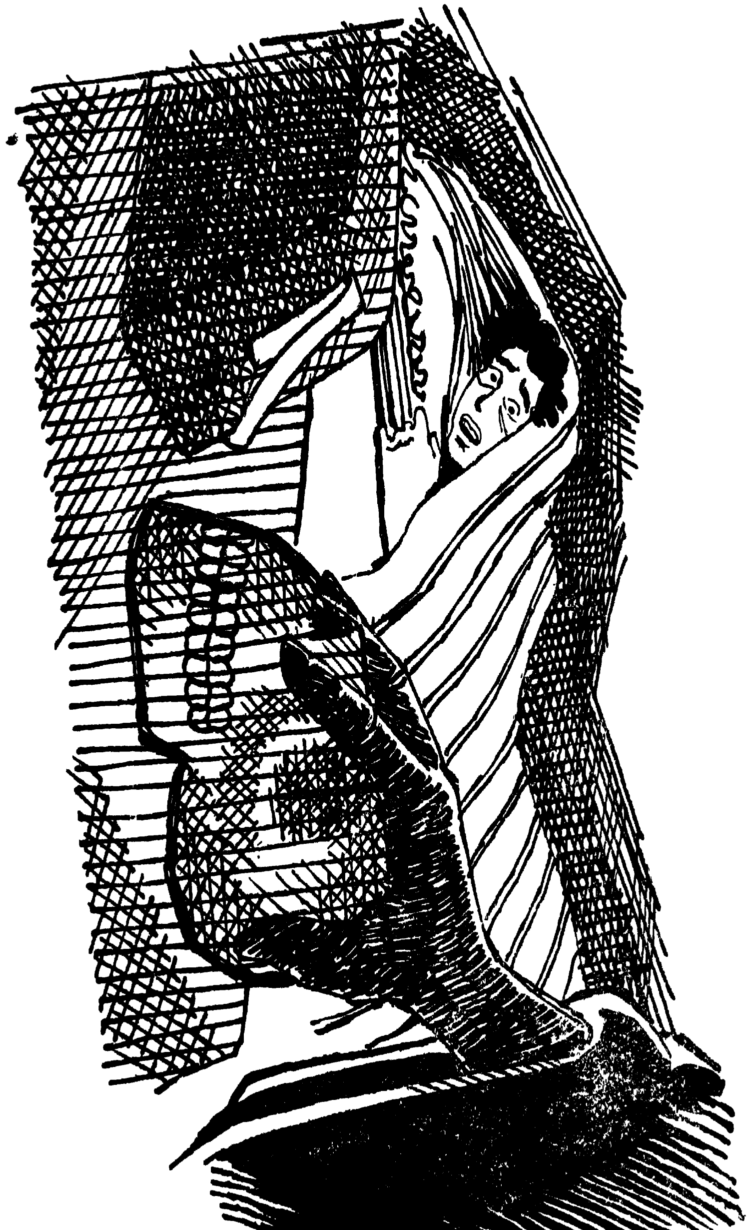
ঠিক ধরেছো। বাড়িটার চারপাশে চারটে লাউডস্পীকার। আমার ঘরে একটা মাউথপিস। রিসারচের কাজে ব্যস্ত থাকি বলে উঠতে পারি না। ওখানে বসে বসেই অরডার দিই।

আপনার রিসারচ কী নিয়ে ?

বলবো, বলবো। সময় হলেই জানতে পারবে।

তারপর হঠাৎ কাবলীকাকু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওরা তিনমাইল দূরের চিতলকোট পাহাড়ে বেড়াতে গেলো। এক্কা চালিয়ে নিয়ে গেলো মংরু।



ঘুম ভেঙে গাবলু অপলক চেয়ে থাকে ছায়ামূর্তির দিকে

চিতলকোট পাহাড়টা খুবই ছোট। তিন হাজার ফুটের বেশি নয়। দেখতে অনেকটা মন্দিরের মতো। উপরে উঠবার রাস্তাও তেমন জটিল নয়। দুর্গম নয়। বেশ বোঝা যায়, প্রায়ই লোকজন এই পাহাড়ে বেড়াতে আসে। ফলে উপরে উঠবার একটা রাস্তা তৈরি হয়েই আছে। পাহাড়ের নীচে একটি দোকান। চা, বিড়ি আর শস্তার বিস্কুট পাওয়া যায়। বললে ডিমের ব্যবস্থাও ওরা কর দেয়।

মংরু ওপরে উঠতে চাইলো না। ছড়ি হাতে একটা রাখাল ছেলে দাঁড়িয়েছিলো। সে বললো, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ওরা ছেলেটিকে সঙ্গে নিলো।

যাবার সময় মংরু বললো, জলদি ফিরবেন বাবুরা। আন্ধার হয়ে গেলে বাঘ আসতে পারে।

এই শুনে গাবলু একটু দমে গিয়েছিলো। ডাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে আর মুখ খুলতে ভরসা পেলো না।

উঠতে উঠতে মাঝপথে ওরা একজায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়।

তখন গাবলু ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি মংরুকে চেনো?

নেহি, জী।

মংরু এখানকার লোক নয়?

নেহী, জী।

এখানে ভূত আছে নাকি?

জী হ্যাঁ।

ডাকাত?

ও ভি হ্যায়।

তুমি গোলাপ বাঁধ চেনো?

গুলাবী বাঁধ? চিনি। ওখানে ভূত আছে।

তাই নাকি? তুমি ভূত দেখেছো?

একবার দেখেছি।

কেমন দেখতে ?

মালুম নেহী। লেকিন বহুৎ লম্বা ভুত।

গাবলু আর প্রশ্ন করে না। আবার উঠতে থাকে।

ফিরে আসে সন্ধ্যের অনেক আগেই। গাবলুই জোর করে নেমে আসে। চিতল বাঘের মুখে পড়লে আর রক্ষে আছে ?

ফিরতি পথে এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে। দুই বন্ধু পাহাড়ে চড়ার গল্পে মত্ত। মংরু চুপচাপ।

চৌমাথার কাছাকাছি আসতেই গাবলু হঠাৎ চিৎকার ওঠে, রোক্‌কে, রোক্‌কে।

মংরু লাগাম টেনে অবাক চোখে পেছনে ফিরে তাকায়।

এক্কাটাও কয়েক পা' গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাবলু তড়াক করে লাফিয়ে ডান দিকের গলি দিয়ে ছুটে যায়। গাবলুর সাহস দেখে ডাবলু তো অবাক। ও কিছু বুঝতে না পেরে পিছু নেয়।

একটু দৌড়ে গিয়ে গাবলু সামনের লোকটাকে ডাকতে থাকে, হরবিলাসবাবু? হরবিলাসবাবু ? ও হরবিলাসবাবু ?

লোকটি চমকে পিছন ফেরে। চোখে বিস্ময়। মুখ শক্ত পাথরের মতো।

গাবলু ও ডাবলু ততক্ষণে লোকটির কাছে এসে পড়েছে। কেমন আছেন হরবিলাসবাবু ? গাবলু মধুমাখানো গলায় বলে।

কে বললে আমি হরবিলাস ? লোকটি ধমকে ওঠে।

আলবৎ আপনি হরবিলাসবাবু। আমাকে চিনতে পারছেন না ? গাবলু প্রশ্ন করে।

পারছি না। কী করে জানলেন, আমার নাম হরবিলাস ? লোকটির গলা আগের মতোই কর্কশ শোনালো।

গাবলু খুক খুক করে হাসলো। বললো, আমাকে একজন বলেছিলো, ছ' ফুটের উপর লম্বা লোকদের নাম হরবিলাস হবেই। তাই আমার মনে হলো, আপনি হরবিলাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। ঠিক কিনা !

লোকটি কটমট করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। কোন কথা বললো না। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলো।

ওরা ফিরে আসে।

তাহলে কি......

শেষ করতে না দিয়ে গাবলু বলে উঠলো, ঠিক ধরেছিস। এখন বাড়ি চ।

বাড়ি ফিরতেই কাবলীকাকু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলেন।

এসো, এসো। একটা জরুরী চিঠি এসেছে।

চিঠি? ওরা অবাক হয়।

কাবলীকাকুর পাশে একজন বসেছিলেন। চিঠিটা ছিলো তাঁর হাতে। তিনিই এগিয়ে দিলেন একটা খাম, ডাবলু পড়ে জানলো, ওর বাবা চিঠিটা লিখেছেন কাবলীকাকুকে। ভীষণ বিপদ। অবিলম্বে ছেলে দু'টোকে পাঠিয়ে দেবে।

বারবার পড়লো চিঠিটা। তারপর গাবলুকে দিলো। গাবলুর কানে কানে কী একটা বললো।

তাহলে, তোমরা আজকের রাতের ট্রেনেই চলে যাও। কাবলী কাকু বলেন।

যাওয়ার কোন দরকার নেই, কাবলীকাকু। ডাবলু বলল।

সে কি!

চিঠিটা জাল। আমার বাবার হাতের লেখা আমি খুব ভালোই চিনি। এটা কোনমতেই বাবার লেখা নয়।

কৈ, দেখি দেখি। বলে কাবলীকাকু চিঠিটা নিয়ে খুব মনোযোগ

দিয়ে দেখতে লাগলেন। পরে বললেন, তাই তো। আমারও মনে হচ্ছে এটা নিমাই-এর হাতের লেখা নয়।

তাছাড়া, ডাবলু বলে, বাবা কখনও ইংরেজিতে চিঠি লেখেন না। আপনাকে যে ক'টা চিঠি লিখেছেন, তার একটাও কি ইংরাজিতে লেখা ?

না।

আর একটা মজার কথা, বাবা নিজের নাম ভুল লিখবেন তা ভাবাও যায় না। নিমাই বানান যা লেখা হয়েছে, তাতে নিমাই হয়েছে নিমে।

এক্সসেলেন্ট। পাশে বসা ভদ্রলোক বলে ওঠেন।

এমন সময় গাবলু মুখ খুললো, ডাবলু ঠিক বলেছে। আর একটা জিনিষও চোখে পড়ার মতো। ডাবলুর বাবা চিঠিটা ডাকে ফেলতে পারেন কোথায় ? হয় ভাটপাড়াতে, নয়তো অফিসে এসে কোলকাতায়। সে ক্ষেত্রে চিঠির গায়ে ভাটপাড়া না হয় কোলকাতার ডাকঘরের ছাপ থাকতো। এরকম কোন ছাপ চিঠিতে নেই। একটি ছাপ। তা হলো এখানকার ডাকঘরের।

রিয়েলী, এরা দেখছি বাঘা ডিটেকটিভ সব! পাশে বসা ভদ্রলোক খুশি খুশি গলায় বলেন।

এখন আর অবিলম্বে ফিরে যাওয়ার কোন কথা ওঠে না। কিন্তু কথা হলো, তাহলে কে লিখলো এই চিঠি ? এখানকারই কেউ না কেউ। কেন লিখলো ? কি উদ্দেশ্য ? ওদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে চায় ? কেন ? এইসব নিয়ে ওদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। আগন্তুক ভদ্রলোকও আলোচনায় যোগ দিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ওদের পরিচয় হলো। উনি হলেন এই এলাকার অর্থাৎ লাখরাজপুর থানার পুলিশ অফিসার।

পরিচয় পেয়ে গাবলু খুব খুশি। বললো, ভালোই হলো। আপনাকে দরকার হতে পারে।

হলেই ডাকবে। তোমরা সব হীরের টুকরো ছেলে। ডাকলেই চলে আসবো। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

রাত্রে শোয়ার আগে গাবলু একটা কাণ্ড করলো। সঙ্গে করে এনেছিলো সুলেখা লাল কালি। লাল কালিতে লিখতে ওর খুব ভালো লাগে। কিন্তু এখন ও এই লাল কালিটা দরজা থেকে টেবিল পর্যন্ত, যেখানে কিট ব্যাগ দু'টো আছে, ততখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দিলো।

এটা কেন? ডাবলু প্রশ্ন করে।

ছায়ামূর্তি আজকেও আসবে। আমার ধারণা। গাবলু বলে গম্ভীরভাবে।

ওরা শুয়ে পড়লো।

ডাবলু?

বল্।

দরকার হলে তোকে রাত্রে চিমটি কাটবো। তুই উঠে পড়বি। শব্দ করবি না কিন্তু।

ঠিক আছে।

ডাবলু পাশ ফিরে শোয়। গাবলু ভাবতে থাকে। স্টেশনে চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটা, ভূতের গল্প, ছায়ামূর্তি, মন্দিরে নতুন

তালা, হরবিলাস, তারপরে চিঠি। চোখের সামনে ছবির মতো ভাসতে থাকে। ক্রমেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। শারলক হোমস্ হলে কী করতেন? অথবা ব্লেক? কিম্বা ব্যোমকেশ?

গাবলু ভেবেছিলো, জেগে থাকবে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। ওর অনুমানে কোন ভুল হয়নি। আবার সেই ছায়ামূর্তি!

স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এই সময় ওর হঠাৎ মনে হলো, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকলেও বাইরে থেকে তা অনায়াসে খোলা যায়। এবং নিঃশব্দে। তা না হলে ছায়ামূর্তিটা ঘরে ঢুকলো কী করে? গাবলু বালিশের পাশে রাখা টর্চটায় হাত দেয়। তুলে নেয়। জ্বালায় না।

মূর্তিটা টেবিলের কাছে চলে আসে পা টিপে টিপে। কিছু একটা নামিয়ে রাখলো আলতো ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে দরজা পার হয়ে মিলিয়ে গেল।

এই সময় গাবলু চিমটি কাটলো ডাবলুকে। ডাবলু আচমকা জেগে উঠে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। গাবলু ওর মুখ চেপে ধরে।

চটপট বেরো। ছায়ামূর্তিটাকে ফলো করতে হবে। কুইক। গাবলু ফিসফিসিয়ে বলে।

মুহূর্তের মধ্যে ওরা বারান্দায় চলে আসে। অন্ধকার বারান্দার শেষপ্রান্তে ছায়ামূর্তিটাকে চলে যেতে দেখা যায়। ওরাও পিছু নেয়।

সাবধান ! টের পায় না যেন। গাবলুর গলা।

মূর্তিটা দিঘির দিকে চলে যেতে থাকে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে দেয়াল বরাবর এগোয়। সেখানে একটা ছোটো দরজা। দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে দ্রুত হাঁটতে থাকে।

ডাবলুরাও পিছু পিছু চলতে থাকে। মূর্তিটার সঙ্গে তাল্ রাখতে গিয়ে ওদের প্রায় দৌড়তে হয়। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ওরা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মূর্তিটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে পেছনে তাকালো কি না, অন্ধকারে ঠিক দেখা গেল না। একে তো অন্ধকার, তার উপর ঝির ঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে শীতও বেশ। টের পেলো নাকি ? ডাবলু নীচু গলায় প্রশ্ন করে।

হতে পারে। সাবধানে চলিস্। গাবলু হুঁশিয়ার করে দেয়।

আবার চলা শুরু হয়।

একবার ডাইনে মোড় নিলো। কিছুটা চলে আবার ডাইনে। এবার আঁকাবাঁকা পথ। তারপর বাঁয়ে ঘুরে সিধে চলতে লাগলো।

কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছিস ? গাবলু বলে।

না।

মন্দিরের দিকে।

ঠিক বলছিস ?

একদম ঠিক।

হঠাৎ মূর্তিটা যেন মিলিয়ে গেলো। ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

গাবলুই প্রথম কথা বললো, ফিরে চ। এখন মন্দিরে গিয়ে লাভ নেই। ধরা পড়লে প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে হবে না।

ওরা ফিরে এলো। সারা রাস্তায় কেউ একটা কথা বললো না। যে পথে গিয়েছিলো, ফিরলোও সেই পথে। দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে ডাবলু প্রথম কথা বললো,' ব্যাপারটা কী বলতো ?

এখনও বোঝা যাচ্ছে না। গাবলু উত্তর দেয়।

বারান্দায় পা দিয়ে গাবলু দাঁড়িয়ে পড়ে।

বলে, মংরুর খোঁজ করে দেখি তো ?

বাড়িটার শেষ প্রান্তে উত্তর দিকের একটা ঘরে মংরু থাকে। দরজা বন্ধ। ওরা আস্তে আস্তে দরজা ঠেললো। ভেতর থেকে খিল দিয়ে রেখেছে।

এবার ডাকলো ডাবলু, মংরু ?

আশ্চর্য। এক ডাকেই সাড়া দিলো, কে ? দাদাবাবুরা ?

জেগে আছো ?

হাঁ জী।

ঠিক আছে। ঘুমোও।

ওরা নিজেদের ঘরের দিকে ফিরে আসে। ঘরে ঢোকার আগে বারান্দায় আলো জ্বালালো। ভারি জুতোর ছাপ। ঘর থেকে সোজা বারান্দা পেরিয়ে চলে গেছে। লাল কালি আর কাদা মিলে জুতোর অবিকল ছাপ পড়েছে।

বাটার জুতো। ডাবলু বললো।

ডাবলু নীচু হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

বললো, বেশ বড় সাইজের জুতো মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বালতেই ডাবলুর চোখ গেল টেবিলের উপর।

একী! ডাবলুর চাপা চিৎকার।

গাবলু এগিয়ে এসে টেবিলটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

একটা মানুষের মাথার খুলি।

পাঁচ

সকালবেলায় চায়ের টেবিলে কাবলীকাকুকে দেখে ওরা দুজনেই চমকে ওঠে। লাল টকটকে চোখ। উসকো খুসকো চুল।

আপনার কী শরীর খারাপ? গাবলু সরাসরি প্রশ্ন করে।

না তো!

আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে!

ও হো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়েছি তো, সেইজন্যই বোধহয় একটু শুকনো শুকনো দেখতে লাগছে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ। পড়ছিলাম আর কি।

আচ্ছা, কাল রাতে আপনি কিছু শুনতে পাননি? এই কোন শব্দ টব্দ……

কৈ না তো?

কিছু দেখেছেন? কোন ছায়ামূর্ত্তি বা অন্য কিছু?

একদম না। ব্যাপার কী বলো তো?

ডাবলু তখন বললো, কাল রাতে কে যেন আমাদের ঘরে এসে একটা মানুষের মাথার খুলি রেখে গিয়েছে।

তোমাদের ঘরে? কাবলীকাকু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ। এখনও সেটা রয়েছে টেবিলের উপর।

দেখি চলো তো।

বলেই কাবলীকাকু প্রায় ছুটে চলে যান। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

কিন্তু ঘরে ঢুকে অবাক। টেবিলের উপর খুলিটা নেই।

আশ্চর্য! এই তো যাবার সময় দেখে গেলাম! ডাবলু বলে।

হুঁ। বুঝেছি। এসব হো হো দলের কাজ, সন্দেহ নেই।

আবার? কাবলীকাকুকে চিন্তিত দেখালো।

হো হো মানে? গাবলু প্রশ্ন করে।

সে একটা কাহিনী।

বলেই কাবলীকাকু তক্তপোষের উপর বসে পড়েন। তাঁর পাশে বসে ডাবলু। মুখোমুখি টেবিলের উপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসলো গাবলু।

কাবলীকাকু বলতে থাকেন, প্রায় ১২ বছর আগেকার কথা। তোমাদের মনে থাকার কথা নয়, সে সময় বেনারসে একটা ব্যাপারে হৈ হৈ পড়ে যায়। প্রায়ই লোকজন খুন হতে থাকে। আর প্রত্যেক বারই দেখা যাচ্ছে, খুনীরা মানুষ মেরে তার মাথাটা কেটে নিয়ে চলে যায়। এমন কি রাত্রে শ্মশানে যে সব মড়া পোড়াতে আসে, একটু সুযোগ পেলে কে বা কারা যেন মড়ার মাথাটা কেটে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পর পর এ রকম ঘটতে থাকায় বেনারসে ও আশে পাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও এর কোন কুল কিনারা করতে পারলো না। বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা ফেল মারলো।

এদিকে ব্যাপারটা কিন্তু ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সারা উত্তর প্রদেশেই কোথাও না কোথাও এই রকম ঘটনা ঘটতে লাগলো।

সেই সময় আমি ছিলাম চুনার ফোরটের কাছাকাছি একটা

গ্রামে। একদিন মেঠো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। বেশ রাত হয়েছে। একটা ঝোপ পেরোতেই দেখি একদল লোক হঠাৎ কোত্থেকে এসে আমাকে ঘিরে ফেললো। একজন কোন কথা না বলে আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

আমি তো হতভম্ব। কোনমতে বললাম, আমাকে বেঁধেছো কেন? কে তোমরা?

আমার কোন কথার জবাব কেউ দিলো না।

একজন বললো, সর্দ্দার এটার গর্দান নিয়ে নিই?

একজন আমার সামনে এগিয়ে এলো। অন্ধকারে তার মুখ ভালো দেখা গেলো না। মনে হলো, এই লোকটাই সর্দ্দার হবে। লোকটি আমাকে আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

তারপর বললো, ভদ্দরলোক মনে হচ্ছে। গর্দানে দরকার নেই। কাজে লাগবে। নিয়ে চল।

ওরা আমাকে নিয়ে চললো সঙ্গে করে। এইভাবে আমি ওদের দলের সঙ্গে ভীড়ে গেলাম। আসল কথা, যেতে বাধ্য হলাম। এরা হলো মানুষের খুলি সংগ্রহকারী দলেরই একটি অংশ। দলটির নাম হো হো। এর মানে যে কী আমি আজও তা জানি না।

আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম প্রায় দু'বছর। ওরা আমাকে নানা ভাবে কাজে লাগাতো। পুলিশের ভয়ে ওরা বড় একটা শহরে আসতে চাইতো না। অথচ শহরে ওদের আসার দরকার ছিলো। খুলি সংগ্রহ করে সেগুলি এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দিলেই ওদের কাজ শেষ হতো। এজেন্টরা সবাই থাকতো শহরে। খুলি নিয়ে

ওরা সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিতো। তারপর এজেন্টরা ওইসব খুলি বিদেশে চালান করতো।

আমার কাজ পড়েছিলো বাক্স বোঝাই খুলি এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আবার তা দলের সর্দ্দারের কাছে পৌঁছে দেয়া। এতে ওদের খুব সুবিধে হয়েছিলো। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। আমার মতো শিক্ষিত সুদর্শন একজন বাঙালী যে এর সঙ্গে জড়িত, তা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি।

কিন্তু আমার নিজেরই খারাপ লাগতে লাগলো। পালাবারও উপায় নেই। সবসময়ই ওদের লোক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে ঘুরতো।

একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। তখন এলাহাবাদে ছিলাম। খুলি বোঝাই বাক্স পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার পথে হঠাৎ একটা লরিকে হাত দেখিয়ে থামাই। লরির ড্রাইভার আমাকে তুলে নেয়। সেই লরি করেই আমি একেবারে পাটনায় এসে পৌঁছাই। ওরা বুঝতেও পারেনি, আমি কী করে উধাও হয়ে যাই।

তারপর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। শেষ পর্যন্ত আমার ধারনা হয়, ওদের হাত থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি···কাবলীকাকু কথা বন্ধ করেন।

আচ্ছা, আপনি দু'বছর ওদের সঙ্গে ছিলেন। তাই না? গাবলু প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

তাহলে আপনি ওদের অনেক কিছুই জেনে ফেলেছিলেন?

জেনেছিলাম। ওদের দলের পাণ্ডাকেও চিনেছিলাম। অনেকের নামও জেনেছিলাম।

সে সব আপনি পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিতে পারেন, এই ভয় থাকা ওদের স্বাভাবিক। তাই নয়?

ঠিক। কিন্তু পুলিশকে আমি কিছুই জানাইনি।

তা জানাননি। কিন্তু, ওদের ভয় তো আর যায়নি?

হতে পারে। তুমি বলছো, ওরা আমার অনুসন্ধান এখনও চালিয়ে যাচ্ছে?

নিশ্চয়ই। আমার ধারণা, আপনাকে ওরা এতদিনে খুঁজেও পেয়েছে। তাছাড়া......

তাছাড়া কী?

আপনাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করে থাকতে পারে। আর বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতে ওরা হয়তো বদ্ধপরিকর।

কাবলীকাকুকে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত দেখালো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, আমি একবার শহরে যাচ্ছি। গোলায় কী একটা গোলমাল হয়েছে।

একটু পরেই গেটের ওপাশে এক্কা চলার শব্দ কানে এলো। শহরে কাবলীকাকুর কাঠের মস্তবড় গোলা।

ডাবলু আর গাবলু কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো।

কেউ কোন কথা বললো না। হো হো দলের ব্যাপারটা আরও জটিল। গাবলু মনে মনে হিসেব করে। একটা প্রশ্ন তীরের মতো বিঁধতে থাকে। কাবলীকাকু এতো টাকা পেলেন কোথায়? বাড়ি কিনলেন, জমি করলেন। আবার কাঠের ব্যবসায় নামলেন।

এতে অনেক টাকার দরকার। এত টাকা কোথা থেকে এলো ?

কথাটা ফাঁস করলো না গাবলু। মুখে বললো, চ। কাবলীকাকুর ঘরটা একবার সার্চ করে দেখি।

সার্চ ?

হ্যাঁ। সার্চ। কাবলীকাকু নিজেই একটা মস্ত রহস্য। আর সেটাই আগে জানা দরকার।

কিন্তু না বলে কয়ে ওঁর ঘরে ঢোকা কা ঠিক হবে ? ডাবলু ইতস্তত করে।

উপায় নেই। ঢুকতেই হবে।

এমন সময় মংরু এসে বললো, দাদাবাবুরা আপনারা এখন বাড়িতেই থাকবেন তো ?

হ্যাঁ। কেন ?

আমি একটু বাজারে যাবো। দেরী হবে।

বেশ। যাও।

তাতে আরও সুবিধে হলো। বাড়িতে কেউ রইলো না দুই বন্ধু ছাড়া।

কাবলীকাকুর ঘরের সামনে এসে দেখলো, তালা ঝুলছে। এবার কী করে ঢুকবি ? ডাবলু বলে।

তালা ভেঙে ফ্যাল। গাবলু নির্দ্বিধায় হুকুম দেয়।

সে কি রে ?

ভয় নেই। হো হো দলের লোকেরা কী তালা ভাঙতে পারে না ?

অগত্যা ওরা তালা ভেঙেই ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা খুব বড় নয়। এক পাশে একটা খাট। পরিপাটি বিছানা। অন্যপাশে একটা টেবিল। টেবিলের এক কোণে একটি মাইক। অন্য কোণে একটা টেবিল ল্যাম্প। একটি মাত্র চেয়ার। টেবিলের উপরে কয়েকটি বাঁধানো খাতা নানা সাইজের। তিন চার রকমের কলম। টেবিল ঘিরে তিনটি র‍্যাক। তাতে গাদা করা ইংরেজি হিন্দি বাংলা খবরের কাগজ

গাবলু খাতাগুলি উলটে পালটে দেখলো। প্রত্যেক খাতায় কাগজ থেকে কেটে নেওয়া ছোট ছোট খবর আঠা দিয়ে লাগানো। গাবলু মন দিয়ে খবরগুলি পড়ে। প্রত্যেকটিই খুনের খবর। পাশে লাল নীল পেনসিলে লেখা নোট। নোটগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত। কোনটায় লেখা : হো হো বলে মনে হচ্ছে। কোনটায় লেখা : নিছক অ্যাকসিডেন্ট। কোনটায় লেখা : হৌশিয়ার সিং। কোনটায় লেখা : বিন্ধ্যাচল। কিম্বা লখনউ। ইত্যাদি।

ভাবলু খবরের কাগজগুলি পরীক্ষা করে। বহু রকমের কাগজ। অধিকাংশই কাটা। দু'দিন আগের খবরের কাগজও দেখতে পায়।

টেবিলের দু'পাশে দেরাজ। গাবলু একে একে সব কয়টি দেরাজই খুললো। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাওয়া গেল না। কেবল একটি ডাইরী পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেলো কিছু চিঠি এবং একটি চিরকুট।

প্রথমেই চিঠিগুলি পরীক্ষা করলো। ইংরেজী ও বাংলায় লেখা চিঠিগুলি অধিকাংশই ব্যবসা সংক্রান্ত। কিছু আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের। ডাবলুর বাবার লেখা দু'টি চিঠিও আছে।

তারপর খুললো ডাইরী। পাতার পর পাতা উলটে গেল। ডাইরী বলতে যা বোঝায়, এটা ঠিক তা নয়। এতে হিসেব আছে,

লোকের ঠিকানা আছে। আবার মাঝে মাঝে কিছুটা লেখাও আছে। লেখার অংশগুলি মন দিয়ে পড়লো। তেমন কিছু মনে হলো না।

চিরকুটটা হিন্দিতে লেখা। হলদে একটুকরো কাগজের উপর নীল কালিতে লেখা। ডাবলুকে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিলো।

বললো, তুই তো একটু আধটু হিন্দি পড়তে পারিস। দেখতো কী লিখেছে?

ডাবলু অনেকক্ষণ ধরে পড়তে চেষ্টা করলো। পরে বললো, যা লেখা আছে তা মানে করলে দাঁড়ায়—পাপ করলে মরতেই হবে।

বুঝেছি।

কী বুঝেছিস?

হৌ হৌ দল কাবলীকাকুকে ভয় দেখিয়ে এই চিরকুট পাঠিয়েছে। কিন্তু কাবলীকাকু আমাদের কছে বেমালুম তা চেপে গিয়েছেন।

তাই হবে বোধহয়। ডাবলু মন্তব্য করে।

গাবলু এক টুকরো কাগজে খস খস করে কি একটা লিখলো। টেবিলের উপর কাগজটা রেখে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিলো।

তারপর বললো, চলে আয়। হৌ হৌ দল ধরা পড়ে যেতে পারে।

কী লিখলি তুই? ডাবলু বলে।

পরে বলবো।

ছয়

দুপুরে ওরা ঠিক করেছিলো রামগেড়িয়া ঝর্ণা দেখতে যাবে। জামা কাপড় পরে তৈরিও হচ্ছিলো। কিন্তু যাওয়া হলো না।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন কাবলীকাকু।

ওরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

কাবলীকাকু নিজেই বললেন, আমার ঘরে হৌ হৌ-র লোক ঢুকেছিলো।

তাই নাকি? গাবলু বিস্মিত।

কিছু নিয়ে গেছে কি না, দেখেছেন? ডাবলু জানতে চায়।

তেমন তো কিছু চোখে পড়েনি। তবে পাওয়া গেছে একটা জিনিস। কাবলীকাকু জানান।

কি জিনিষ?

কাবলীকাকু কোন কথা না বলে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দেন। মাঝখানে ডাবলু খপ করে কাগজটা হাতিয়ে নিয়েই পড়তে থাকে। ইংরেজিতে ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা, যার মানে করলে দাঁড়ায়: আর মাত্র তিনদিন বাকী।

এর মানে কী? ডাবলু জিজ্ঞেস করে।

গাবলু ভীষণ গম্ভীর।

কাবলীকাকু বলেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

একেবারেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তা নয়। হো হো কিম্বা অন্য কেউ আপনাকে একটা আলটিমেটাম দিয়েছে। যা হবার, তিনদিনের মধ্যেই হবে।

হবেটা কী? ডাবলুর প্রশ্ন।

তা আমি কী করে জানবো? হো হো দলের হয়তো খুলির অভাব ঘটেছে। এখানে একসঙ্গে তিনটে পেয়ে যাবে। গাবলু নির্বিকার চিত্তে বলে যায়।

হুঁ। বলেই কাবলীকাকু একই ভঙ্গীতে হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যান।

গাবলু খুব মন দিয়ে জামার বোতাম লাগায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ডাবলু। ওর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কী সব হচ্ছে? কেনই বা হচ্ছে এসব?

চ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। গাবলু প্রস্তাব করে।

রামগেড়িয়া ঝর্ণা দেখতে?

না। ওটা থাক। অন্য কোথাও। গাবলু এর বেশি আর বলে না।

ওরা ঠিক করলো হাঁটা পথে যাবে।

প্রথমেই গেলো ডাকঘরে। গ্রামের মানুষ ভীড় করে এসেছে। এইটেই নিয়ম। রোজ ডাক বিলি সম্ভব নয় একটা মানুষের পক্ষে। তাই গ্রামের লোকেরাই এসে চিঠি নিয়ে যায় নিজের নিজের পাড়ার। কেউ কেউ চিঠি নিয়ে চলেও যাচ্ছে।

ওরা এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

কী রে, এখানে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ডাবলু জানতে চায়।

হরবিলাসের সঙ্গে কথা বলবো। গাবলু জানায়।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো। একটা মাত্র ঘরে ডাকঘরের যাবতীয় কাজ। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে নানারকম কথাবার্তা ভেসে আসছে। ওরা ঠিক ধরতে পারে না। একেবারে দেহাতী ছন্দ। বিন্দুবিসর্গও মালুম হচ্ছে না।

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখলো ডাবলু। লোকটিও ওদের দেখে হঠাৎ কেমন থমকে যায়। তারপরই আচমকা ভেতরে ঢুকে পড়ে।

সেই পুলিশ অফিসারটা রে। ডাবলু জানায়।

হুঁ। গাবলু কথা বলে না।

ওরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। পুলিশ অফিসারটাকে আর বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না।

এদিকে ডাকঘরের জানলায় চিঠি প্রত্যাশী গ্রামের মানুষের ভীড় কমে এসেছে। এখন দু'চারজন লোক খাম পোস্টকার্ড কিনে নিয়ে যাচ্ছে। গাবলু এগিয়ে গেলো।

আমাদের কোন চিঠি আছে? গাবলু মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করে।

হরবিলাসের চোখের দৃষ্টি কিন্তু কটমটে। অবাক হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। আগেই খবর পেয়ে গিয়েছে। স্থির চোখ মেলে তাকিয়ে আছে হরবিলাস। রাগ রাগ মুখ।

চিঠি আছে ?

নেহি। উত্তর দিলো হরবিলাস। গলা অত্যন্ত গম্ভীর।

ফিক করে হেসে গাবলু আদুরে গলায় বললো, রেগে যাচ্ছেন কেন ? হরবিলাসবাবু, আপনার ইংরেজি হাতের লেখা তো ভালোই। তবে দু'একটা বানান ভুল হয়।

বাজে বকবেন না। কি চাই আপনাদের ?

একটা পোস্টকার্ড।

ওরা পোস্টকার্ড নিয়ে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় নেমে ডাবলু জানতে চাইলো, এবার ?

লাখরাজপুর থানা।

একজন পথচারীর কাছ থেকে থানার রাস্তা জেনে নিয়ে ওরা দ্রুত পা চালালো।

যেতে যেতে গাবলু বললো, পোস্টাফিসে গিয়ে দারুন লাভ হয়েছে।

পুলিশ অফিসার ?

ঠিক। আচ্ছা, তুই-ই বল, একজন পুলিশ অফিসারের আচার আচরণ কখনও এরকম হয় ?

তাছাড়া, ডাবলু যোগ করে, পুলিশ অফিসার কিন্তু কখনও লোকটাকে ইউনিফরম পরা অবস্থায় দেখিনি।

গুড। গুড অবজারভেশন। গাবলু বন্ধুর প্রশংসা করে।

আর দু'তিনটি খবর পাকাপাকি জানতে পারলেই সব জানা হয়ে যাবে। তখন শুধু লাটাই গোটানো। গাবলু বলে।

কিন্তু অ্যাকশান হলো না তো! ডাবলু হাতের মাস্‌ল ফোলায়।

হতেও পারে। এখনই হতাশ হবার কি আছে ? গাবলু সান্ত্বনা দেয়।

ওরা এসে পৌঁছলো লাখরাজপুর থানায়। সামনেই এক দারোগা একমনে কী একটা লিখছেন।

গাবলু সটান গিয়ে তাঁকে বললো, আচ্ছা আমরা পুলিশ অফিসার মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

আমিই মোহন সিং। বলুন কি দরকার। দারোগা বললেন।

গাবলু অবাক হয়ে যায়। ওর সন্দেহ মিথ্যে নয়। কিন্তু, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ওই মোহন সিং আসলে কে ?

আপনার সঙ্গে আমাদের একটু প্রাইভেট কথা ছিলো।

কী ব্যাপারে বলুন ?

অন্য একটা ঘরে, মানে যেখানে আর কেউ থাকবে না......।

বুঝেছি। আসুন !

ওরা পাশের একটা ঘরে গেলো। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গাবলু দারোগার মুখোমুখি বসলো।

আমরা হৌ হৌ সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি।

আরে ! আমরা হৌ হৌ নিয়েই এখন ব্যস্ত।

গাবলু এখানে আসার পর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বললো।

দারোগা গাবলুর কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত। এরপর দু'জনে মিলে একটা প্ল্যান করলো। উঠে আসবার সময় গাবলু বললো, কাল বিকেলে আমরা আসবো। আর একটা কথা, কাবলীকাকুকে কিছু বলবেন না।

সাত

পরদিন সকালে ওদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়। সকাল সাতটা বেশ বেলা। রোদের তেজও বেশ।

ঘর থেকে বেরিয়ে মুখ হাত না ধুয়েই গাবলু ছুটলো কাবলীকাকুর ঘরে। সঙ্গে যথারীতি ডাবলু।

ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে কাবলীকাকু কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

অবাক হয়ে দরজার বাইরে দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

একটু পরে একজন বেরিয়ে এলো।

সেই পুলিশ অফিসারটি।

ওরা দু'জনেই অবাক।

গাবলু সামলে নেয়।

আরে আপনি! ভালো আছেন? গাবলু বলে।

অবাক পুলিশ অফিসারটিও।

একটু থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ। ভালো। ভালোই তো আছি। তা, তোমাদের খবর কি?

খবর আর কী? চলে যাচ্ছেন? গাবলু জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ। একটু তাড়া আছে।

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে ওরাও।

গেট পেরিয়ে ভদ্রলোক একটু থামলেন।

আর তখনই গাবলু বললো, কাল ভোরেই আমরা চলে যাচ্ছি। কাবলীকাকুও যাবেন।

কাবলীবাবুও যাচ্ছেন? কৈ, উনি তো বললেন না?

গাবলু লক্ষ করলো, কাবলীবাবুর চলে যাওয়ার খবরে উনি যেন দারুণ চমকে গিয়েছেন।

বললো, বলতে হয়তো ভুলে গিয়েছেন!

কবে ফিরবেন ?

ফিরবেন না বোধহয়।

সে কি ?

হ্যাঁ। সেইরকমই তো কথা আছে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপরে চট পট সাইকেলে উঠে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

ওরাও ফিরে এলো কাবলীকাকুর ঘরে। পথে ডাবলু মুখ খুললো, মিথ্যে করে বললি কেন ?

পাখি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ওদের আজ রাত্রেই একটা

কিছু করে ফেলতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের মস্ত সুযোগ।

কাবলীকাকু ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে বলেন, কী ব্যাপার ?

কাবলীকাকু, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। হো হো দলের লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে লেগেছে, এটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?

হ্যাঁ। বুঝতে ঠিকই পারছি। বলতে কি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এই গ্যাখো না আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই দেখি দরজার পাল্লায় গেঁথে আছে একটা তীর। তীরের ডগায় সুতো দিয়ে বাঁধা এক টুকরো চিঠি।

কাবলীকাকু চিঠিটি এগিয়ে দিলেন। প্রথমে পড়লো ডাবলু। তারপর দিলো গাবলুকে। চিঠিটি এক লাইনের। হিন্দিতে লেখা। যার মানে হলো: পলাতকের শাস্তি মৃত্যু। এবং চল্লিশ হাজার।

চল্লিশ হাজার মানে? গাবলু প্রশ্ন করে।

কি জানি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কাবলীকাকুর গলা বেশ নরম।

গাবলু কিছু একটা ভাবে। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বলে আচ্ছা এই লোকটি—মানে আজ সকালে যে এসেছিলেন—উনি যে একজন সত্যিই পুলিশ অফিসার, তা জানলেন কী করে?

কোন প্রমাণ পাইনি। মাসখানেক আগে লোকটি নিজেই এসেছিলো আমার কাছে। পুলিশ অফিসার বলে পরিচয় দেয়।

আচ্ছা, লোকটি কেন এসেছিলো? একটা কিছু বলতে চায় সে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। সে নাকি শুনেছে, আমি বাড়িটা বিক্রি করে দেবো। বাড়িটা সে কিনে নিতে চায়।

আর কিছু?

আর বলেছিলো, হো হো দল নাকি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশের কাছেও খবর আছে। পুলিশ ওই দলের পাণ্ডাকে ধরতে চায়। কোন কিছু ঘটলেই যেন তাকে জানানো হয়।

হুঁ। আচ্ছা, মংরু এখানে কতদিন কাজ করছে?

তা প্রায় মাস দুই হবে।

আগে চিনতেন ওকে?

না।

আচ্ছা, হো হো দলের পাণ্ডার নাম কি হোশিয়ার সিং?



ফিরে দেখি দরজায় গেঁথে আছে তীর

কাবলীকাকু চমকে ওঠেন, তুমি কি করে জানলে ?

অনুমান করলাম।

এরপর কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। পরে গাবলু বললো, কাবলীকাকু এখন থেকে আর আপনি একা কোথাও বেরোবেন না। আর কারো সঙ্গে দেখাও করবেন না।

কাবলীকাকু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। বেশ বোঝা যায়, ভয় পেয়েছেন।

ওরা আর দাঁড়ালো না।

সেদিন দুপুরে ওদের রামগেড়িয়া ঝর্ণা দেখতে যাওয়ার কথা। খাওয়া দাওয়ার পর দুই বন্ধু মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলো, ডাবলু বাড়িতে থাকবে। কাবলীকাকুকে চোখে চোখে রাখবে। আর নজর রাখবে মংরুর উপরেও। গাবলু একা যাবে লাখরাজপুরে থানায়।

রামগেড়িয়া ঝর্ণা আর দেখতে যাওয়া হলো না।

বিকেল চারটের মধ্যেই গাবলু ফিরে এলো। একমুঠো লজেন্সও কিনে এনেছে। ডাবলুকে একটা দিয়ে বললো, খা।

কাবলীকাকুকে বলা হলো, মংরুকে ডেকে বলুন—কাল আমরা চলে যাচ্ছি। আপনিও যাবেন। যাবার সময় ওর মাইনে কড়ি মিটিয়ে দেওয়া হবে।

কেন ? একথা বলতে যাবো কেন ? কাবলীকাকু অবাক হন।

দরকার আছে। আপনার ভালোর জন্যই এটা বলতে হবে। হো হো কিন্তু আপনাকে এবার রেহাই দেবে না। গাবলু বললো বেশ গম্ভীরভাবে।

কাবলীকাকু কী বুঝলেন কে জানে। বাধ্য ছেলের মতো মংরুকে ডেকে হুবহু ওই কথাগুলি বললেন। মংরু অবাক। দু'চোখে পলক পড়ে না। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না।

কবে ফিরবেন, হুজুর? নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করে।

কাবলীকাকু বলার আগেই গাবলু বলে ওঠে, আর ফিরবেন না তো। সেইজন্যই তো তোমার মাইনেপত্তর মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বাড়িটার কী হবে, হুজুর? কাবলীকাকুর দিকে তাকিয়ে মংরু প্রশ্ন করে।

এবারও উত্তর দিলো গাবলুই, বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। দু'একদিকের মধ্যেই নতুন লোকজন এসে যাবে।

মংরু মাথা নীচু করে চলে যায়।

এর এক ঘণ্টা পরে গাবলুর কথায় ডাবলু গেলো মংরুর খোঁজে।

ফিরে এসে বললো, বাছাধনের পাত্তা নেই।

গাবলু মিটি মিটি হাসছে।

তাই দেখে কাবলীকাকু প্রশ্ন করেন, হাসছো যে?

এমনি। এইরকমই একটা কিছু হবে, ভেবেছিলাম। গাবলু হাসতে হাসতেই বলে।

কাবলীকাকু জিজ্ঞেস করেন, সত্যি সত্যি হো হো দল এখানে হানা দেবে?

গাবলু মনে মনে অবাক হয়, কাবলীকাকু হঠাৎ এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? তাহলে কি আমার অনুমান সত্যি? চল্লিশ হাজারের রহস্যটা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু একটা অনুমান করা চলে।

গাবলু বলে, আমার ধারণা, ওরা আপনাকে ছাড়বে না। কিছুতেই

নয়। আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু হবে।

আজ রাত্রেই ? কাবলীকাকুর মুখ চোখ বিবর্ণ দেখায়।

সন্ধ্যার দিকে মংরু ফিরে এলো। কাবলীকাকুর কাছে এসে বললো, হুজুর ! আজ রাত্রে আমাকে ছুটি দিতে হবে। কাল ভোর বেলায় ঠিক এসে যাবো।

কাবলীকাকু বুঝতে পারেন না, কী করবেন। এবারও গাবলু আগ বাড়িয়ে বলে, ঠিক আছে। যেয়ো। তবে কাল ভোরেই আসা চাই কিন্তু।

জী, হুজুর।

স্টেশনে আমাদের তুলে দিয়ে আসতে হবে।

জী, হুজুর।

আট

রাত ন'টার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সারা। তার একটু পরেই মংরু চলে গেলো রান্নাঘরে তালা ঝুলিয়ে। তালা ঝোলালো নিজের ঘরেও।

আজ রাতে ওরা তিনজন একসঙ্গে। সামনের বারান্দায় তিনটি চেয়ারে বসে আছে। বাড়িটার সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ বোধ হয় অমাবস্যা। ঘন অন্ধকার চারদিকে। তার মধ্যে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। বাড়িটার মধ্যে তিনটি প্রাণী। চুপচাপ বসে আছে। মুখে কথা নেই। চোখে অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ শোনা যায়। দূরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার একঘেয়ে আওয়াজ। এইভাবে কেটে গেলো অনেকক্ষণ। দেওয়াল ঘড়িতে তিনজনকে চমকে দিয়ে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। তিনজনেই শুনলো ঘণ্টার আওয়াজ। কেউ মুখ খুললো না।

হঠাৎ……

একটি ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। কাবলী-কাকু একটু নড়ে উঠেই চুপ করে যান। ডাবলু ঠাহর করতে পারে না কে?

গাবলুর গলা শোনা গেল, আসুন মোহনবাবু।

মূর্তিটি সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে আসে। তার পেছনে আরও দু'জন।

ততক্ষণে কাবলীকাকু সম্বিৎ ফিরে পান। বলেন, মোহনবাবু? মানে······

গাবলু চাপা গলায় বলে, না উনি নন। এই মোহন সিং হলেন সত্যিকারের দারোগা। তা মোহনবাবু, সব ঠিক আছে?

ইয়েস। মোহনবাবু গাবলুর পাশে একটা খালি চেয়ারে বসতে বসতে বলেন।

সামনে তখনও দু'জন দাঁড়িয়ে। ওদের লক্ষ্য করে মোহনবাবু বললেন, তোমরা ওদের সঙ্গেই থাকো। সিগন্যাল পেলে আসবে।

ইয়েস স্যার। ওরা চলে যায়।

ক'জন সেপাই এনেছেন? গাবলুর প্রশ্ন।

এক ডজন। দ্যাট ইজ এনাফ।

এনাফ।

কিছুক্ষণ পরে মোহনবাবু বললেন, আর দেরি করা ঠিক নয়। এবার চলুন।

মোহনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গাবলুও উঠে পড়লো।

কাবলীকাকু প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিলো গাবলু, মন্দিরে। সেখানে হো হো দলকে পাওয়া যাবে।

গেটের বাইরে এসে মোহনবাবু তুড়ি বাজিয়ে কাউকে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে এসে হাজির হলো সেপাইরা।

অন্ধকার নির্জন রাস্তা। ছোট একটি টর্চ হাতে গাবলু আগে আগে চললো। তার পেছনে মোহনবাবু। তারপর ডাবলু। ডাবলুর পেছনে কাবলীকাকু। একটু দূরে দূরে সেপাইরা।

দাঁড়ান। মোহনবাবুর গলা শোনা গেল।

গাবলু ঘুরে দাঁড়ালো।

এই পিস্তলটা নিন। গাবলুর দিকে একটা পিস্তল এগিয়ে দিলেন মোহনবাবু।

আমি ওটা ছুঁড়তে জানি না।

তা হোক, সঙ্গে রাখুন।

দিন।

ওরা মন্দিরটার কাছে এসে পড়লো। কোন নির্দেশ দিতে হলো না। সেপাইরা চুপি চুপি মন্দিরটা ঘিরে ফেললো।

দরজা জানলা সবই বন্ধ। তবু দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে ম্লান আলো বাইরে ছিটকে এসে পড়েছে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন মোহনবাবু। সঙ্গে গাবলু।

দরজায় কান পেতে শুনলেন, ফিস ফিস করে কারা যেন কথা বলছে। কথাবার্তা ভালো শোনা যায় না। দেহাতী হিন্দি। গাবলু একবর্ণও বুঝলো না।

মোহনবাবু মাথা নীচু করে গাবলুর কানে কানে বললেন, এটাক?

ইয়েস। গাবলু সায় দেয়।

একটু দূরে কাবলীকাকু আর ডাবলু দাঁড়িয়ে। ওরা আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে মোহনবাবু আর গাবলুকে।

ডান হাতে পিস্তলটা শক্ত করে ধরে আছেন মোহনবাবু। বাঁ হাতে দরজায় ধাক্কা মারেন। দুম দুম দুম।

হঠাৎ মন্দিরের ভেতরের কথাবার্তা ফিসফিসানি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ উত্তর দেয় না।

এবার আর একটু জোরে ধাক্কা দেন মোহনবাবু।

মন্দিরের ভেতরকার আলো নিভে যায়। কোন উত্তর আসে না। দরজা খোলে না।

দরওয়াজা খুল দে। মোহনবাবু গর্জন করে ওঠেন।

আবার নীরবতা। ভেতর থেকে কেউ কোন সাড়া দেয় না।

মোহনবাবু পকেট থেকে বাঁশি বের করে বাজালেন।

পু...পু...পু...

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইদের হাতের ভারী টর্চ জ্বলে ওঠে।

একসঙ্গে টর্চগুলি জ্বলে ওঠায় হঠাৎ যেন আলোর বন্যা বয়ে যায়। তাতে কাবলীকাকু ও ডাবলুর চোখ ধাধিয়ে ওঠে।

এবার ভেতর থেকে শব্দ আসে, কৌন ?

দরওয়াজা খুলো পহেলে। মোহনবাবুর বজ্রকণ্ঠ। কেউ দরজা খোলে না।

মোহনবাবু ডান দিকে ফিরে শূন্যে হঠাৎ ফায়ার করেন।

গুড়ুম্।

একটু পরে দরজা খোলার শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাবু একপাশে সরে দাঁড়ান। ওকে দেখে গাবলুও পাশ ফিরে দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে নিজেকে আড়াল করে। দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেপাইদের টর্চের আলো গিয়ে পড়লো মন্দিরের ভেতরে।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই নকল দারোগা মোহন সিং।

হ্যানডস আপ! মোহনবাবুর পিস্তলের নল জাল মোহন সিং-এর বুক বরাবর।

সেপাইরা ছুটে এসে হাতকড়া পরিয়ে দেয় জাল মোহন সিং-এর হাতে। এরপর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গ্রেফতার করা হলো মংরু আর হরবিলাসকে। এবং আরও একজনকে।

সার্চ করে মন্দিরের ভেতর থেকে পাওয়া গেল চারটে মানুষের মাথার খুলি। দু'টি রণপা। দু'জোড়া জুতো। একটি তালা ও চাবি। আর কিছু টুকিটাকি। একটি বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেল দু'টো ছোরা। একটি ধনুক ও কয়েকটি তীরও পাওয়া গেল।

সবাইকে নিয়ে ফিরে আসা হলো কাবলীকাকুর বাড়িতে। বারান্দায় আলো জ্বেলে দেওয়া হলো। মাঝখানের একটা চেয়ারে বসানো হলো জাল মোহন সিংকে। বারান্দার সামনে ও দু'পাশে বন্দুক হাতে সেপাইরা।

কেউ কোন কথা বলছে না। মোহনবাবু ডাইরী বের করে কী যেন লিখলেন।

হঠাৎ গাবলু বললো, কাবলীকাকু যাদের ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে মংরু আর হরবিলাসকে আপনি চিনতে পারছেন। কিন্তু জাল মোহন সিংকে আপনি ঠিক চেনেন না।

এবার গাবলু তড়াক করে লাফিয়ে চলে যায় জাল মোহন সিং-এর কাছে। একটানে নকল দাড়ি গোফ টেনে নামিয়ে দেয়। মাথার পরচুলাটাও সরিয়ে ফেলে।

এবার চিনতে পারছেন? গাবলু প্রশ্ন করে।

হোশিয়ার সিং! কাবলীকাকু চিৎকার করে ওঠেন!

ঠিক ধরেছেন। ইনিই সেই। হো হো দলের পাণ্ডা।

নয়

পরদিন সকালে নয়, রাত্রের গাড়িতে গাবলু আর ডাবলু রওয়ানা হলো বাড়ির পথে। তার আগে মোহনবাবুর কাছ থেকে ঘুরে এলো গাবলু। মোহনবাবু জানালেন, হৌশিয়ার সিং তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

গাবলুকে মোহনবাবু ভেতরে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে, ডাবলু বা কাবলীকাকুর কাছে তা অজানা। মোহনবাবু ওদের দুই বন্ধুকে জানালেন অসংখ্য ধন্যবাদ।

গাড়িতে বসে ডাবলু প্রথমেই বললো, মোহনবাবু তোকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কী বললেন রে ?

হৌশিয়ার সিং-এর জবানবন্দীটা শোনালেন। সেটা না জানা পর্যন্ত ব্যাপারটা পরিস্কার হচ্ছিলো না।

ব্যাপারটা কী ? আমি তো এখনও বুঝে উঠতে পারছি না ! ডাবলু বলে।

আচ্ছা বলছি শোন। ফাঁকা গাড়িতে গাবলু বেঞ্চির উপর আসনপিঁড়ি হয়ে গুছিয়ে বসলো।

হো হো দল থেকে পালিয়ে আসার পর ওরা অনেকদিন কাবলী-কাকুর খোঁজ করেছে। বেশ ভয় পেয়ে যায়। খুলি সংগ্রহের

কাজও বন্ধ করে দেয়। কাবলীকাকুকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত ওদের মনে নানারকম আশংকা ছিল। সকলেই গা ঢাকা দেয়। কিন্তু গোপনে অনুসন্ধান চলতেই থাকে। দু'টো কারণে ওরা কাবলীকাকুকে খুঁজছিলো। একটা কারণ পরে বলবো। আর একটা কারণ হলো, ওদের ভয় হয়েছিলো কাবলীকাকু পুলিশের কাছে ওদের সবকিছু ফাঁস করে দিতে পারে।

অনেক খুঁজেও ওরা কাবলীকাকুর সন্ধান পায় না। ক্রমে পুলিশের হামলাও কমে আসে। তখন ওরা আবার কাজ শুরু করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু এতদিনে দলের লোকজন সব ছড়িয়ে পড়েছে। যোগাযোগও তেমন নেই। অনেকে আর ওই কাজ করতে রাজিও হলো না। দল ভেঙে গেল।

দলের পাণ্ডা হোশিয়ার সিং নতুন ভাবে জীবন শুরু করবে বলে এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত হোসেনাবাদে এসে হাজির হলো।

এখানেও একটা মজা আছে। হোশিয়ার সিং কিন্তু হোসেনাবাদেরই ছেলে। খুব ছেলেবেলায় এখান থেকে চলে যায়। ফিরে আসে দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে পরচুলা পরে। অনেকদিন পরে। ফলে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। হোসেনাবাদের হোশিয়ার সিং—দুই-এর আদ্যাক্ষর নিয়ে দলের নাম হো হো। এখানে এসে হোশিয়ার সিং আচমকা আবিষ্কার করলো কাবলীকাকুকে, দেখা মাত্রই হোশিয়ার সিং-এর মনে প্রতিহিংসা জ্বলে উঠলো।

হোশিয়ার সিং ঠিক করলো, কাবলীকাকুকে ভয় দেখিয়ে কাজ

হাসিল করবে। ততক্ষণে পুরোনো ব্যবসাটাও চালু করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। আর সেইজন্যই কাবলীকাকুর বাড়িটাও তার দরকার।

দলের একটিমাত্র লোক হোঁশিয়ার সিং-এর সঙ্গে এসেছিলো। তার নাম মংরু। নতুন করে দলে টানলো হরবিলাসকে।

কাবলীকাকুর কাছে এমন একটা জিনিষ আছে, যা হোঁশিয়ার সিং আদায় করতে চায়। আর ওই বাড়ি থেকেও তাকে তাড়াতে চায়। খুন করে নতুন কোন বিপদ সৃষ্টি করার মতলব তার ছিলো না।

মংরু ঢুকে গেল কাবলীকাকুর বাড়িতে চাকর হয়ে। মংরুই রাত্রিবেলা মড়ার খুলি ফেলে রেখে আস্তে আস্তে ভূতের গল্পটা চাউর করতে থাকে। এদের আস্তানা হয় পরিত্যক্ত মন্দিরটা।

এমন সময় আমরা এসে পড়লাম। হোঁশিয়ার সিং একটু বিপদে পড়লো। ও ভাবলো, কাবলীকাকুই ভয় পেয়ে আমাদের আনিয়েছে দল ভারী করতে। এবং আমরা যদি পুলিশে খবর দিই, তাহলে মুশকিল হবে। কাবীলকাকু যে চট করে পুলিশে খবর দিতে যাবেন না বা যাওয়ার কথাই উঠবে না তা ওরা জানতো। কারণ, হোশিয়ার সিং এখন নিজেই পুলিশ অফিসার। বললে তো ওকেই আগে বলবেন কাবলীকাকু।

আমরা আসার আগে থেকেই হোঁশিয়ার সিং সাবধান হয়েছিল। কাবলীকাকুর চিঠিপত্র খুলে দেখা হতো। সে কাজটা করতো হরবিলাস। সে তোর বাবার চিঠি থেকে আমাদের আসার খবরটা

জানতে পারে। হৌশিয়ার সিংকে বলে। হৌশিয়ার সিং গোড়া থেকেই আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছিলো।

স্টেশনে হরবিলাস এসেছিলো রহস্যময় মূর্তিতে। ওর একটা অসুবিধে হলো, ও ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। লম্বা লোকেদেরও বিপদ কম নয়।

তারপরে প্রথম রাত্রে আমাদের ঘরে হানা দেয় মংরু। সেটা পরে আমি জানতে পারি মংরুর ঘরে হানা দিয়ে। ওর ঘরে পাই একটা মুখোশ আর এক জোড়া জুতো। মংরুর আসার কারণ, আমাদের জিনিষপত্র দেখা—কিছু পাওয়া যায় কিনা। দ্বিতীয় রাত্রে কিন্তু মংরু আসেনি। এসেছিলো হরবিলাস। টেবিলে মড়ার খুলি রেখে যায়।

সেই রাত্রের ঘটনার পর কাবলীকাকু আমাদের কাছে হো হো দলের গল্পটা বলেন। গল্পের সবটা ঠিক বলেন নি। একটা বিষয় চেপে যান। আর সেই থেকেই আমার একটা সন্দেহ হয়। মন্দিরটা যে ওদের আস্তানা সেটা বুঝেছিলাম, মন্দিরের লাগানো নতুন তালা দেখে।

চিতলকোট থেকে ফেরার পথে হরবিলাসকে একটু বাজিয়ে নিলাম। ওর সম্পর্কে সন্দেহ আরও বাড়লো।

ফিরে এসে পেলাম চিঠি। চিঠিটা যে জাল আমরা তা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলি। সেটা নকল মোহন সিং-এর সামনেই ঘটে। এতে মোহন সিং আরও হুশিয়ার হয়ে যায়।

ঘটনাচক্রে আমরা আবিষ্কার করি মোহন সিং জাল।

এবার আমি দু'টো ফাঁদ পাতি। এক, কাবলীকাকুকে চিরকুটে লিখে জানাই তিনদিনের মধ্যে একটা কিছু হবে। কাবলীকাকুকে ভয় দেখানোই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। কারণ, হো হো সম্পর্কে তিনি আমাদের কাছে—সব সত্যি কথা বলেন নি। তাছাড়া এতদিন পরে হো হো দলের ফিরে আসাটা তিনি সহজে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না।

আমার দ্বিতীয় ফাঁদ হলো, জাল মোহন সিংকে মিথ্যে করে বলা যে, কাবলীকাকু আমাদের সঙ্গে কাল চলে যাচ্ছেন। আর বোধহয় ফিরবেন না। হোশিয়ার সিং বা জাল মোহনবাবু দেখলেন, পাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেরী করলেন না। ওইদিন রাত্রেই কাবলীকাকুকে গায়েব করার প্ল্যান করলেন। মংরুও কাবলীকাকুর চলে যাওয়ার খবর পেয়ে সটান চলে যায় হোশিয়ার সিং-এর কাছে। সেখানেই প্ল্যান তৈরি হয়। মংরু ফিরে এসে ছুটি নিলো।

তারপর যা ঘটলো, সবই তুই জানিস।

একটা কথা, জাল মোহন সিং-ই যে হোশিয়ার সিং এটা জানলি কী করে? ডাবলু প্রশ্ন করে।

আমি ঠিক শিওর ছিলাম না। তবে ওর দাড়ি গোঁফ আর চুল যে নকল, তা আমার চোখ এড়ায়নি। পুলিশ অফিসার হয়েও কখনও ইউনিফরম পরতে দেখিনি, এটা আমার দ্বিতীয় সন্দেহ। তার পর তো জানাই গেলো, লোকটা জাল। আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়াতেই হোশিয়ার সিংকে জানা গেল। এবং সেটা একমাত্র কাবলীকাকুই জানতে পারেন। আর কারও পক্ষে হোশিয়ার সিংকে চেনা সম্ভব ছিলো না।

হরবিলাসের কী স্বার্থ ছিলো ?

টাকা। ও কেবল টাকার জন্যই এসব করতো।

আচ্ছা, তুই বলেছিস দু'টো কারণে হোশিয়ার সিং কাবলীকাকুকে খুঁজছিলো। প্রথম কারণটা বলেছিস। দ্বিতীয় কারণটা কী ?

সেটাই আসল কারণ। আর সেইজন্যই হোশিয়ার সিং হঠাৎ নাগালের মধ্যে কাবলীকাকুকে পেয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে।

চল্লিশ হাজার টাকা ?

ঠিক ধরেছিস। কাবলীকাকু যেদিন ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রাকে উঠে পালিয়ে আসেন, সেদিন ওঁর কাছে ছিলো দলের চল্লিশ হাজার টাকা। সেটাও তিনি সঙ্গে করে আনেন।

আর সেইজন্যই বুঝি কাবলীকাকু হো হো দলের কথা পুলিসের কাছে বলতে পারেননি। পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। আমাদের কাছেও চেপে গিয়েছেন।

ঠিক। গাবলু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

ডাবলু হাসি হাসি মুখে বন্ধুর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, সত্যি গাবলু একদিন বড় হয়ে মস্ত ডিটেকটিভ হবে।

শেষ